কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : প্রেমেন্দ্র মিত্র

সহকারী সম্পাদক : সমর সেন

বার্ষিক সূচীপত্র : প্রথম বর্ষ

আশ্বিন, ১৩৪২—আষাঢ়, ১৩৪৩

অজিত দত্ত

ন খলু ন খলু বাণঃ	আশ্বিন,	২৫
বাড়ী বদল	পৌষ,	৩২
মিস্—	চৈত্র,	৪২

জীবনানন্দ দাশ

মৃত্যুর আগে	আশ্বিন,	২২
বনলতা সেন	পৌষ,	২২
কুড়ি বছর পর	”	২৩
মৃত মাংস	”	২৫
ঘাস	”	২৬
হাওয়ার রাত	চৈত্র,	১
আমি যদি হতাম	”	৪
হায়, চিল—	”	৬
শঙ্খমালা	আষাঢ়,	২৩
বুনো হাঁস	”	২৫

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

সূর্য্যোদয়	আষাঢ়,	৩০

পরিমল রায়

গ্রামোফোন	আষাঢ়,	৩৯

প্রণব রায়		
আলাপ	আশ্বিন,	২৭
প্রেমেন্দ্র মিত্র		
তামাসা	আষাঢ়,	১
কাল রাত	চৈত্র,	১৪
তুমি এস	”	১৬
নীল দিন	”	১৮
বিষ্ণু দে		
পঙ্কমুখ	আশ্বিন,	৯
প্রথম পার্টি	পৌষ,	২৯
বিবমিষা	চৈত্র,	~~৪০~~
মৃত্যু, প্রেম ও মহাকাল	আষাঢ়,	৩৩
বুদ্ধদেব বসু		
চিল্কায় সকাল	আশ্বিন,	৪
ঘুমের গান	”	৬
বিরহ	”	৮
কোকিল, ওগো কোকিল	পৌষ,	৮
দময়ন্তী	”	১০
নতুন কবিতা (সমালোচনা)	”	৪২
ভুবনেশ্বরে প্রার্থনা	চৈত্র,	২১
সমুদ্র-স্নান	”	২৪
হ্রদের ধারে শান্তি	”	২৮
স্বপ্ন আসে, স্বপ্ন ভেঙে যায়	আষাঢ়,	১১
এখন বিকেল	”	১৬

যুবনাশ্ব		
বীণাপানি	চৈত্র,	৩৩
পরিশেষ	”	৩৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
ছুটি	পৌষ,	১
চিঠি-পত্র	”	৩৯
শিবরাম চক্রবর্ত্তী		
কবিতা	চৈত্র,	৩৭
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য		
নীলিমাকে	আশ্বিন,	১৭
সমর সেন		
Amor stands upon you.	আশ্বিন,	১৩
মুক্তি	”	১৪
স্মৃতি	”	১৫
প্রেম	”	১৬
বিস্মৃতি	পৌষ,	১৫
দুঃস্বপ্ন	”	১৬
ইতিহাস	”	১৭
সাড়া	”	১৮
মহুয়ার দেশ	চৈত্র,	৭
Lo the fair dead !	”	৯
চার অধ্যায়	আষাঢ়,	১
ক্লান্তি	”	৬
বিরহ	”	৭

সমর সেন

উর্ব্বশী	আষাঢ়	৮
শেষ বসন্ত	”	৯
একটি মেয়ে	”	১০

সম্পাদকীয় প্রবন্ধ

কবিতায় দুর্ব্বোধ্যতা	আশ্বিন,	৩৪
আধুনিকতার মোহ	পৌষ,	৩৩
গদ্য ছন্দ	চৈত্র,	৪৪
কিপলিঙ ও হাউসম্যান	আষাঢ়,	৪১
কবিতার পাঠক	”	৪২

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

জাগরণ	আশ্বিন,	১৮
জন্মান্তর	”	২০
শেক্‌স্‌পীয়রের সনেট অবলম্বনে	পৌষ,	২৭
ডাক	চৈত্র,	৩০
প্রতীক	আষাঢ়,	২৬

স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

প্রচ্ছন্ন	আশ্বিন,	২৯
স্বপ্ন-সিদ্ধি	পৌষ,	১৯
পুরুৎঠাকুর	”	২০
আলো	আষাঢ়,	২৯

হেমচন্দ্র বাগচী

সমাপ্তির স্বর	আশ্বিন,	৩১
মহামায়া ও পৃথিবী	আষাঢ়,	৩৯

কবিতা

প্রথম বর্ষ আশ্বিন, ১৩৪২ প্রথম সংখ্যা

তামাসা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

তামাসাটা রেখো মনে,
ইলেকট্রনের মরীচিকার এই তামাসা।
মেঘের রঙীন পাড় বুনেছে পড়ন্ত রোদ;
আর মাটির তরঙ্গ গিয়ে মিশেছে নীল দিগন্তে;
রাতের বৃষ্টি-ভেজা সহরে,
পথের খোদলে-খোদলে গ্যাসের আলো আছে জমে',
পিচের ওপর যাচ্ছে পিছলে।
ভালো লাগল বুঝি,
ভালো লাগল আকাশের তারা আর ঘাসের ফুল
আর তার চোখের সেই দীর্ঘ পল্লব
ঘন মেঘের মত যা রহস্য-ছায়া ফেলে
অতল তার চোখের হ্রদে!
কবে দেখেছ অসহায় শিশুর মুখ
পথের ধারে;
কবে, নিঃসঙ্গ বিনিদ্র রাতে,
সান্ত্বনাহীন সেই কান্না কেঁদেছ, আত্মার পরাভবে
শুধু যৌবন যা কাঁদতে পারে;

জেনেছ কোনদিন
অতর্কিত মৃত্যুর অসীম অতল হতাশা,
অর্থহীনতায় ভয়ঙ্কর ;—
এ সবই তোমার ভ্রান্তি শুধু
তোমার মরীচিকা !
বিধাতা ভাবেন ইলেকট্রনের গণিতে।
ছায়াপথ ছাড়িয়ে
অসীম আকাশ জুড়ে
নীহারিকা-পুঞ্জে তাঁর অঙ্কের খেলা।
পথের ধারে
বেড়ায় ঘেরা বিদেশীগাছ
যেদিন চমকে দেবে হঠাৎ পুষ্পিত আহ্বানে,
আর সাধ হবে যেদিন
তার কালো চুলে সমস্ত চেতনা ঢেকে দিতে
ভুলো না সেদিন ইলেকট্রনের এই তামাসা।
তুমি ভালবাস আর কাঁদ
আর নিরুত্তর আকাশে পাঠাও
আত্মার নিরুদ্দেশ জিজ্ঞাসা ;—
বিধাতা ভাবেন শুধু ইলেকট্রনের গণিতে
নির্ব্বিকার নির্ভুল অঙ্কের হিসাবে।
মনে রেখো ইলেকট্রনের তামাসা !

কিন্তু কেনই বা মনে রাখবো ?
আকাশে থাকুক জটিল দেশ-কাল-জড়ানো জ্যামিতি,
সৃষ্টিময় অনন্ত অঙ্কের কাটাকাটি ;
আমার থাক
সমস্ত অঙ্কের এপিঠে
মিথ্যা মরীচিকার এই ব্যঙ্গ,
নেশার রঙে টলমল
এই মুহূর্ত্ত-বুদ্বুদ,
জন্ম, মৃত্যু, প্রেম,
আনন্দ, বেদনা আর নিষ্ফল এই
আত্মার আকুতি।
জানি, এ- পিঠে নেইক কোনো মানে।
তবু কি হবে তলিয়ে দেখে
এই তামাসা !

চিল্কায় সকাল

বুদ্ধদেব বসু

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন করে' বলি।

কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে :

কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে ;
চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে,
মাঝখানে চিল্কা উঠছে ঝিলকিয়ে।

তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,
ইষ্টিশানে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে।
গাড়ি চলে' গেলো।—কী ভালো তোমাকে বাসি,
কেমন করে' বলি।

আকাশে সূর্যের বন্যা, তাকানো যায় না।
গোরুগুলো একমনে ঘাস ছিঁড়ছে, কী শান্ত!

—তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হ্রদের ধারে এসে আমরা পাবো
যা এতদিন পাইনি।

রূপোলি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতে ঝরে' পড়ছে তার বুকের উপর
সূর্যের চুম্বনে।—এখানে জ্বলে' উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু
তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে
কখনো কি ভেবেছিলে?

কাল চিল্কায় নৌকোয় যেতে-যেতে আমরা দেখেছিলাম
দুটো প্রজাপতি কত দূর থেকে উড়ে আসছে
জলের উপর দিয়ে।—কী দুঃসাহস! তুমি হেসেছিলে, আর আমার
কী ভালো লেগেছিলো

তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ মুখ। দ্যাখো, দ্যাখো,
কেমন নীল এই আকাশ।—আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম
কেমন করে' বলি।

ঘুমের গান

বুদ্ধদেব বসু

আমি ঘুমোতে পারিনে, আমাকে ঘুম পাড়াও,
প্রিয়, প্রিয় আমার, প্রিয়তম।
আমার ঘুম কান্নায় ফুঁপিয়ে ওঠে,
ব্যথায় ছিঁড়ে যায় সব স্বপ্ন :
কাছে এসো, একবার কাছে এসো, আমাকে জড়াও
মণি, মণি আমার, মণিমালা।

আমি ক্লান্ত, তবু ঘুমোতে পারিনে,
প্রিয়, প্রিয় আমার, প্রিয়তম।
ক্লান্তিকে টুকরো করে' দেয় ধারালো কান্না
ব্যথায় ভেঙে যায় হৃৎপিণ্ড :
বাড়াও, শিশির-ঝরানো, শান্তি-ছড়ানো তোমার হাত বাড়াও
মণি, মণি আমার, মণিমালা।

ঘুমোতে পারিনে।
ঘুমের মধ্যে বোবা চীৎকার করে' কাঁদি
দুপুর ভরে', দীর্ঘ দুপুর ভরে', তোমার নাম ধরে'
—প্রিয়, প্রিয় আমার, প্রিয়তম :
আর রাত্রির রথচক্র আমার বুক ভেঙে-ভেঙে দিয়ে গড়িয়ে যায়,
রাত্রির বুক-ফাটা সেই কান্না আমারই বুকের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত।

ঘুম পাড়াও, ঘুম পাড়াও আমাকে,
গান গাও আমার শিয়রে বসে'
বাসনার উন্মেষের, স্বপ্নের স্পন্দনের গান,
আর কান্নার—ভাঙা হৃদয়ের নির্বোধ প্রলাপ :
শুনতে-শুনতে ঝরঝর করে' কাঁদি,
অশ্রুর সমুদ্রে ভেসে যাই,
ডুবে যাই দুঃখের ঢেউয়ের গহ্বরে
নিজেকে ছাড়িয়ে, নিজেকে হারিয়ে
আমার এই দুঃস্বপ্ন-দিন আর বুক-ফাটা রাত্রি পার হ'য়ে।

আমি ঘুমোতে পারিনে, আমাকে ঘুম পাড়াও,
প্রিয়, প্রিয় আমার প্রিয়তম :
বাড়াও, আমার দিকে তোমার পা বাড়াও
স্বপ্ন-ঝরানো তোমার হাত বাড়াও
ছড়াও, কালো চুলের ঠাণ্ডা ঘুম ছড়াও
তোমার কণ্ঠের নিশীথিনীতে আমাকে জড়াও—
মণি, মণি আমার, মণিমালা।

বিরহ

বুদ্ধদেব বসু

সে নেই, আমার সময় কাটে না।
রাত বেড়ে যায়, আমি একা।
রাত বেড়ে যায়, চারদিক চুপচাপ হ'য়ে আসে,
সবুজ সন্ধ্যাতারা বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে যায়,
আকাশের সিঁড়ি ভেঙে ক্লান্ত চাঁদ ধীরে-ধীরে উঠে আসে,
হাওয়ায় লাগে শিশির।
—সে নেই, আমার রাত যে কাটে না।

পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে।
পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে, আমি ঘুমোতে পারিনে।
আমি একা।
কোথায় কোন্ পোকার পাল ডেকে উঠলো করুণ ক্ষীণস্বরে,
শূন্য থেকে অন্ধকার ঝুলে আছে ঘুমন্ত বাদুড়ের ডানার মত,
রাত্রি ঘুমিয়ে আছে।

একা চাঁদ আকাশে।
দূরের কোন্ বন উঠলো চঞ্চল হ'য়ে।
পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়লো,
একটা হরিণ ঘুম-ভাঙা চোখ মেলে' তাকিয়ে আছে।
—আমার সময় যে কাটে না, সে নেই।

পঞ্চমুখ

বিষ্ণু দে

১

যদি মোর কারুশিল্প রচনারা করে' থাকে কোনো অপরাধ
রচনার ব্যর্থতায়, প্রিয়া মোর, পল্লবপ্রচ্ছন্ন তব চোখে,
যদি মোর রচনারা তব শুভ্র সুকুমার তনুর মাধুরী
রূপান্তরে ব্যর্থ হয়, স্বপ্নসুকুমার তব আঁখি-ছায়াপাত
যদি না দিয়েই থাকে শিল্পে মোর ঐশ্বর্য্যের সার্থক প্রসাদ,
যদি মোর কল্পনার মন্দিরের শিখরে তোরণে দেখে লোকে
তোমার হাসির দক্ষ অভিনব গভীরতা অনন্য চাতুরী
তবু তো বলিবে তারা—এ তো কভু ভয়ে ক্ষোভে ভ্রান্তিতে বা শোকে
মৃত্যুরে দেয় নি কর। জীবনের উল্লাসে এ চেয়েছে বরিতে।
লজ্জা মোর অক্ষমতা, তবু প্রিয়া, তুচ্ছ হবে বাহিরের যত অপবাদ
গ্লানি শুধু অক্ষমতা, তাই, আর তোমারেই নিমিত্ত করিতে।

২

উত্তরে হাওয়া লাগেনি কখনো তোমার গায়ে।
পাহাড়তলীর দাবদাহ আজো দেখনি চোখে।
সাহারার বালি পোড়েনি তো আজো কোমল পায়ে!
প্রসার্পিনার পরশ পাওনি এ মরলোকে।
হৃদয়বিহীন খর যৌবনে তোমার হিয়া
হাসি তব তাই বৃথাই ছড়ালো তুষার, প্রিয়া!

আসবে তো এক সাঁঝে বৈরাগী ঘরছাড়া কেউ
—তোমার হৃদয়পাইনের বনে কী কানাকানি !
ঘাটেবাঁধা তব দীঘিতে দুলবে সাগরের ঢেউ—
প্রভাতেই হায় ডেকে নেবে তাকে দূরের বাণী।
আসবে একদা কর্ম্মঠজন, সংসারে তার
শিশিরে শুকাবে প্রেম তো তোমার পত্রবাহার।

সময় এখনো যায়নি ফুরায়ে পথশোধনের—
এই হলো সার ভাবীকথকের এ নিবেদনের।

৩

তুমি তো ফিরাও মুখ
  চোখে তব নীল শর্ব্বরীর
    শঙ্কিত ক্লান্তির দূরাভাস।
তোমার হৃদয়ে কাঁপে পাখীর পালক
  যতো গতিহীন অতীতের স্মৃতি
    বিষন্ন ভীতির গায়ে লাগা।
তবু আমি বলে' যাবো কথা
  বারম্বার উঠে যাবো হৃদয়ে তোমার
    পলে পলে দেবো নিমন্ত্রণ
প্রেম মোর হয়েছে যে প্রতীক্ষায় প্রস্তুতিতে
    দিনরাত্রি আজ চিরজাগা।

একদা আমারই হবে জয়
বারবার বাতাসের হাতে লেগে লেগে
  পুঞ্জীভূত বাতাসের বেগে
    ঝরে' যাবে বিড়ম্বনা, মুক্তি পাবে মানসবলাকা।
হৃদয় তোমার প্রিয়া আমার মনের নীলে ছড়াবে তো পাখা।
মূর্ত্তি পাবে তব দীপ্তি চিত্তে মোর তরুণ তমাল
কোনো একদিন একরাতে কোনোকাল ?

৪

কঠিন হয়েছে ঘন ক্লান্তির ভার—
চলচঞ্চলা ! ঠেলে দিলে তুমি দ্বার।
জীবনানন্দ অনর্থ জড়তার
পাষাণে দিলো কি বেগ ?
জন্ম প্রণয় মরণে জীবনশেষ।

জেগে দেখি তব খরতোয়া হলো শেষ
শুদ্ধ নিথর নিঃস্রোত স্থূল হ্রদে।

৫

যদি আমি জন্মাতুম বহু দূরদেশে
তোমাকে পড়তো মনে, নিতুম কি চিনে ?
আসতুম দূরত্ব এ এড়িয়ে কি হেসে ?
তুমিও চিনতে হেসে পরিচয়হীনে ?

ধরো, যদি তুমি হতে টাহিটির মেয়ে
অজানা রহস্যময়ী মরস্বর্গলোকে,
আমি কি যেতুম সখী প্যাসিফিক বেয়ে ?
বলতুম হেসে, একি ! চেনা লাগে ওকে !
আমরা যে অতি সুখী সকলেই বলে,
আমাদের উভয়ের প্রেমের গৌরব
সকলের মুখে শুনি। লোকমুখে চলে
আমাদের উভয়ের হৃদয়উৎসব।
সুযোগ পেয়ে তো তবে পাশাপাশি মিলি ?
আমাদের ভালবাসা রিফ্লেক্স, লিলি।

Amor stands upon you.
EZRA POUND

সমর সেন

তুমি যেখানেই যাও,
কোনো চকিত মুহূর্ত্তের নিঃশব্দতায়
হঠাৎ শুনতে পাবে
মৃত্যুর গম্ভীর, অবিরাম পদক্ষেপ।

আর, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে ?
তুমি যেখানেই যাও—
আকাশের মহাশূন্য হ'তে জুপিটারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
লেডার শুভ্র বুকে পড়বে।

মুক্তি

সমর সেন

হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এলো—
তখন পশ্চিমের জলন্ত আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল :
সে অন্ধকার মাটিতে আনলো কেতকীর গন্ধ,
রাত্রের অলস স্বপ্ন
এঁকে দিলো কারো চোখে,
সে অন্ধকার জেলে দিলো কামনার কম্পিত শিখা
কুমারীর কমনীয় দেহে।

কেতকীর গন্ধে দুরন্ত,
এই অন্ধকার আমাকে কি করে' ছোঁবে ?
পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি
নির্জ্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

স্মৃতি

সমর সেন

আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হ'য়ে এলাম,
পার হ'য়ে এলাম
মন্থর কত মুহূর্ত্তের দীর্ঘ অবসর ;
স্মৃতির দিগন্তে নেমে এলো গভীর অন্ধকার,
আর এলোমেলো,
ভুলে যাওয়ার হাওয়া এলো ধূসর পথ বেয়ে :
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হ'য়ে এলাম, কত মুহূর্ত্ত,
শ্রান্ত হ'য়ে এলো অগণিত কত প্রহরের ক্রন্দন,
তবু আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।

প্রেম

সমর সেন

বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে
তোমাকে পাবার বাসনা।

আর মাঝে-মাঝে আকাশে হলুদ্ রঙের অদ্ভুত চাঁদ ওঠে,
চঞ্চল বসন্ত কাঁপে গাছের পাতায়,
আর অন্ধকারে লাল কাঁকরের পথ
পড়ে' থাকে অলস স্বপ্নের মতো।

সমস্ত দিন, আর সমস্ত রাত্রি ভরে'—
তোমাকে পাবার বাসনা
বিষাক্ত সাপের মতো।

নীলিমাকে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

রাত্রিতে জেগে ওঠে যে সাগর
অন্ধকারের সাগর—
তুমি তাতে স্নান করে' এসো, নীলিমা,
তোমার চোখ হোক আরো নীল
চুল হোক ধূসর ফুলের মঞ্জরীর মতো।
আর যদি রাত্রিকে বিদীর্ণ করে' ওঠে চাঁদ
তোমার আঁচলে লেগে থাকে যেন সিক্ত জ্যোৎস্না
তোমার বুকে পাই যেন জ্যোৎস্নার গন্ধ :
বলতে পারো, সে জ্যোৎস্না কি নীল হবে, নীলিমা,
নীল পাখির পালকের মতো ?
জানি, তুমি আমায় ডাকবে—
(নীল বন কি কথা কয়ে' উঠলো—
আর মেঘের গায়ে-গায়ে নেমে এলো স্বপ্নরা ?)
আমার চোখ নরম হ'য়ে আসবে ঘুমে, নীলিমা,
তোমাকে নয়, তোমার স্বপ্নকে পেয়ে।

জাগরণ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মিলননিবিড় রাত্রি পরিকীর্ণ নিখিল ভুবনে,
বিরাজে প্রশস্ত কক্ষে তারি শান্তি, তারি নীরবতা,
চাহি খোলা বাতায়নে, দেখি তারি অনাদি বারতা
মর্ম্মরিছে মুহুর্মুহু স্বপ্নাবিষ্ট দেওদারবনে ॥

নাই এ-নিভৃতলোকে নগরের উগ্র উতরোল,
মর্ম্মভেদী পরচর্চ্চা বিষায় না যমকজীবন ;
অলক্ষ্যে অলস নদী করে শুধু নৈশ সংকীর্ত্তন,
কিম্বা সে নিদ্রিত—শুনি দূরাগত কালের কল্লোল ॥

উদার অলকানন্দা হয়ে গেছে মহাকাশ পার
দুপাশে ছড়ায়ে তারা ; বাঁধিয়াছে লক্ষ জোনাকিরে
রজনীগন্ধার গুল্ম ; তাহাদের মিলিত মির্ম্মিরে
মনে হয় অমাবস্যা সুদক্ষিণ সজীব নির্ভার ॥

তোমার চিকণ দেহে বিজড়িত সে-দিব্য কুহক,
ভাস্বর অলজ্জ কটি, দৃপ্ত কুচ, নিঃসঙ্কোচ উরু,
অধরে সিতাভ হাসি, মুক্ত কেশে উথলে অগুরু,
সাবলীল আত্মদান স্নিগ্ধ চোখে এনেছে ঝলক ॥

দেখিতে পাই না কিছু, তবু যেন হয় অনুমান
অরূপ আনন তব চিত্রার্পিত অপূর্ব্ব প্রসাদে,
প্রতি অঙ্গসন্ধিমাঝে নম্র ছায়া কম্র নীড় বাঁধে,
সঞ্চিত গভীরে তব নিঃশ্রেয়স নিবৃত্তি নির্ব্বাণ ॥

তন্ময় আমার চিত্ত, প্রীত বুদ্ধি, তৎগত শরীর,
তথাগত অন্তর্যামী আত্মপর সবারে ক্ষমেছে,
ব্যক্তিতার অবরোধ মুহূর্ত্তেকে চূর্ণ হয়ে গেছে,
সার্ব্বভৌম যৌবরাজ্যে প্রত্যাগত যযাতি স্থবির ॥

সাঙ্গ কি সহস্র বর্ষ ? গর্জ্জে নিচে প্রচ্ছন্ন নরক,
পরশ্রীকাতর ইন্দ্র ঊর্দ্ধ হতে করে বজ্রাঘাত,
চমকে নয়ন মেলি, তমিস্রার আবিল প্রপাত
ডুবায় স্বপ্নেরে মোর, সুরু হয় ধৈর্য্যের পরখ ॥

সুপ্তিশান্ত গৃহদ্বারে হানা দেয় বিনিদ্র নগর,
সচকিত নিঃসঙ্গতা বাহুপাশে হরে মোর শ্বাস,
মন্থর কালের স্রোতে স্তূপীকৃত হয় সর্ব্বনাশ,
মোদের বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুপম ব্যবধি দুস্তর ॥

জন্মান্তর

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আধখানা চাঁদ রূপার কাঠির পরশে
জাগায়েছে তার মুখে কী মদির কান্তি।
নিমেষনিহত স্বচ্ছ চোখের সরসে
ত্রস্ত তারকা সন্ধানে সংক্রান্তি।
রেশমী কেশের ঘন কুঞ্চিত লহরে
ভর করে আছে অনাদি অসীম রাত্রি।
নিরাশনিবিড় আয়ুর অন্ত্য প্রহরে
কেন এলো আজ অনাহূত বরদাত্রী ?

আলাপন তার নিগূঢ় দ্বিধায় ব্যাহত,
তবু কী মমতা লীলায়িত ভুজভঙ্গে।
আমারি মতো সে বহু বঞ্চনে আহত,
মুগ্ধ মিনতি বিজড়িত তবু অঙ্গে।
সর্ব্বহারা সে, হিয়া ভরা পীত স্মরণে,
বহির্বিমুখী, দিবসে উলুকী অন্ধ,
ডাকে অভিসারে আমারে অমোঘ মরণে,
তবু সে মূর্ত্ত জীবনের নির্ব্বন্ধ ॥

জানি না কি দিবো, কি চাবো তাহার স্বকাশে,
বহুবার ঠেকে হয়েছে আজিকে শিক্ষা---

অযাচিত দান দাতার দম্ভ প্রকাশে,
দীন ভিখারীর হীনতা বাখানে ভিক্ষা।
মর্ত্ত্যের ক্ষুধা মিটে না মজুরী ব্যতীত,
স্বর্গের সুধা ইন্দ্রজিতেরই ভোগ্য,
মোর অসাধ্য সাধনের যুগ অতীত,
তবে আর কবে হবো ও-প্রেমের যোগ্য ?

নামুক অরতি অতএব মোর শরীরে,
কামনার বানে বাঁধ বেঁধে দিক ধৈর্য্য,
আত্মবোধের অন্তরতম অরিরে
হানুক মৃত্যু মহানিদ্রার স্থৈর্য্য।
হয়তো তবেই নব জনমের প্রভাতে
অমিত বীর্য্যে বিঁধে অগোচর লক্ষ্য
জিনিবো তাহারে স্বয়ম্বরের সভাতে,
সম্ভাবনায় হবো তার সমকক্ষ ॥

সেদিনে তো আর হবেনা অপব্যয়িত
কিশোর চাঁদের জাদুকর অভিসন্ধি।
চিরন্তনীর চিরাভিলষিত দয়িত
অনাহত ভুজে করিবে তাহারে বন্দী।
টুটিবে মেখলা, খসে যাবে তার কবরী,
তীব্র পুলকে ঘুচিবে সকল লজ্জা।
তুঙ্গী গ্রহেরা হবে বাসরের প্রহরী,
চ্যুত তারাদল বিরচিবে ফুলশয্যা ॥

মৃত্যুর আগে

জীবনানন্দ দাশ

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জ্জন খড়ের মাঠে পউষ-সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর কোলে নিমগ্ন দেউল,
দেখিয়াছি নদীটিরে : ম্লান বাঁকা নিস্তব্ধতা চোখে দেখা যায়
যতদূর ; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকীতে ভ'রে গেছে ; যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে ;

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার :
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ ; অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো !
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ ; মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আস্বাদে ভরা ; অশথের ডালে ডালে ডাকিয়াছে বক ;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক ;

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের পরে হাত
সন্ধ্যার কাকের মত আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে ;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস ;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
শুক্‌নো গুঁড়ির পরে চৈত্রের দুপুরে বেজী করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চাল-ধোয়া গন্ধ পেয়ে ঘাটে এসে মাছগুলো ভিড়েছে দু'বেলা,
শামুকগুগ্‌লি ভরা পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
শুনেছে ঘরের ডাক—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;

দেখেছি ভোরের আলো খেজুরগুঁড়ির পরে দোয়েলেরে ডাকে,
বেতের লতার নীচে চড়ুয়ের ডিমগুলা মুখ গুঁজে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোস্নার উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ;

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নীচে লাল লাল ফল
পড়ে' আছে ; নিঃসহায় ভাঙা মাঠ নেমে গেছে নদীর ভিতরে ;
কাঁচপোকা-টিপ্‌ প'রে গেঁয়ো মেয়েটির মুখ হয়েছে উজ্জ্বল ;
পথে পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর পরে ;
আমরা দেখেছি যারা শুপুরীর সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মত সবুজ সহজ ;

আমরা বুঝেছি যারা বহুদিন মাস ঋতু শেষ হ'লে পর
একটিও নম্র মুখ কাছে এসে অন্ধকারে আন্তরিক কথা
ক'য়ে গেছে ;—আমরা বুঝেছি যারা পৃথিবীর আলোর ভিতর
পথে পথে মেঘ্‌লা দিনের মত র'য়ে গেছে মুগ্ধ সজলতা :
সোঁদা ভিজে ধূলো, মাঠ-কল্‌মীর ঘন দাম, ডাহুকের নীড়,
ভাঙা মন্দিরের ইট, শাদা শাঁখা স্নিগ্ধ হাত, ঘাসের শরীর ;

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর ? জানি না কি আহা,
মৃত্যু এসে একদিন মৃদু কীট জীর্ণ প্রজাপতিটির আগে
রুক্ষহাতে ভেঙে দেবে পৃথিবীর পথে পথে ছড়ায়েছি যাহা
রঙীন ডানার ভরে একদিন ফড়িঙের মত অনুরাগে ;
কি বুঝিতে চাই আর ?…রৌদ্র নিভে গেলে পাখীপাখালীর ডাক
শুনিনি কি ? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক !

ন খলু ন খলু বাণঃ—

অজিতকুমার দত্ত

সংহত করো, সংহত করো অয়ি,
যৌবন-বাণ তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর,
এ নহে তন্দ্রা-অরণ্য-ছায়াচারী
ত্রস্ত হরিণ ; সংহরো তব শর।
তীক্ষ্ণসায়ক দীপ্ত এ-দিবালোকে
ভ্রষ্টলক্ষ্য কোনোমতে হয় পাছে,
শক্তি তোমার সংহত করো অয়ি,
মৃগয়ারো তরে ভিন্ন সে-ঋতু আছে।

গর্ব্বিতা অয়ি বলয়-শৃঙ্খলিতা,
মুহূর্ত্ত ভোলো বন্ধন-কৌশল,
চোখে থাক্ মোহ, হে মোহ-দুর্ব্বিনীতা
বহুছলময়ি, আঁখি হোক ছলছল।
চিত্ত আমার স্তব্ধ সরসী-সম
শুধু ছায়াখানি বক্ষে রাখিব এঁকে,
সুকঠিন মম মর্ম্মের দর্পণে
সায়ক তোমার মিথ্যাই যাবে বেঁকে।

জানিয়ো কন্যা, আলেখ্য নাহি রয়
সরোবর-বুকে নিত্য অনশ্বর,
দর্পণ-পরে বহু ছায়া সঞ্চরে—
অভিমান নাহি সাজে দর্পণ 'পর।
বিদ্যুতে কেবা মুঠিতে বাঁধিতে পারে
বিদ্যুৎ-গতি শাসনে বাঁধিবে কে সে ?
দৃষ্টি-মোহন নভোচারী উল্কারে
কে বাঁধিবে বুকে তপ্ত-ভ্রমণ শেষে ?

দূরবর্ত্তিনি, তোমার আমার মাঝে
উদাসীনতার স্ফটিক প্রাচীর গাঁথা,
দর্শন চাহি, স্পর্শন চাহি না যে
পিপাসু নয়ন, ক্লান্ত চোখের পাতা।
ওগো গর্ব্বিতা, সংহরো সংহরো,
এ নহেক মৃগ ত্রস্ত ও চঞ্চল,
অস্ত্র তোমার যত্নে রক্ষা করো
শূন্য গগনে বাণ হানি' কিবা ফল!

আলাপ

প্রণব রায়

মীনকুমারী ও হাঙরের দেশ থেকে
(ঘুমন্ত সেই সাগরের গুহা থেকে)
চুরি করে' এনে প্রবালের মালা
গলায় তোমার পরিয়ে দিলাম, মেয়ে!
আকাশ-পারের মায়াবীর দেশ থেকে
লুঠ করে এনে রূপালি জ্যোৎস্না,
স্বপ্নের মত রূপালি জ্যোৎস্না
দিয়েছি তোমার আলো-ভরা কালো চোখে।
শাড়ীতে দিলাম গোধূলির রঙ,
মেরু-প্রদেশের অরোরা-র মত রঙ,
ঝলমল আর টলমল করে
লতানো দেহের নরম তরল রেখা!
এই জীবনের নাট্যমঞ্চে এসে
দাঁড়ালে যখন অপরূপ রূপ ধরে',
আমার সকল প্রেমের কবিতা
হ'য়ে গেল যেন পাদপ্রদীপের আলো!
সে-আলোয় লোকে তোমায় নিয়েছে চিনে;
জনতার ঢেউয়ে আমি সরে' গেছি দূরে,
দুই চোখ ভরা সংশয় নিয়ে
আমিই তোমায় চিন্‌তে পারিনি শুধু!

সন্ধ্যাবেলায় লাল-পেড়ে শাড়ী পরে'
(বাটনা-লাগানো সেই লাল-পেড়ে শাড়ী !)
একতলাকার নিরিবিলি ঘরে
বস্‌লে আবার ছোট জানলাটি ঘেঁষে ;
মনে হয় যেয়ে এখন কেবল আমি—
আমিই তোমায় করেছি আবিষ্কার,
ক্লান্ত দেহের রেখায় রেখায়
অলিখিত মোর কবিত নিয়েছে রূপ !
নগর-আকাশে উঠেছে প্রথম তারা,
রোগা মুখে তা'রি সঙ্কেতলিপি পড়ি,
এলোথেলো এলো-চুলের তিমিরে
গূঢ়-রহস্য রাত্রির নেই কূল !
কাছে গিয়ে যেই ছুঁয়েছি তোমার হাত,
(নীল-শিরা-আঁকা স্পষ্ট উষ্ণ হাত)
দু'চোখে তোমার পুরানো বাসনা
জ্বলে' ওঠে যেন ঘরের বাতির মতো !
আমাদের ছোট একতলাকার ঘরে
(পৃথিবীর এই নিরিবিলি এককোণে)
জ্বলে যে পুরানো বাসনার বাতি,
সে-আলোয় মোরা চিনেছি পরস্পরে ॥

প্রচ্ছন্ন

স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

আমি রইলাম কেবল তোমার চিন্তার ধারায়,
অলক্ষিতে নৈর্ব্যক্তিক নৈরাকারে।
পড়্‌ল না পলি তোমার অন্তস্তলে,
তাই বাসনার কমল উঠ্‌ল না ফুটে
ঊর্দ্ধমুখী মৃণালবৃন্তটি অবলম্বন ক'রে।

আমি তাই তোমার অন্তরে থেকেও নাই।
থেকে না থাকার মত ব্যর্থতা কি আর আছে ?
অজ্ঞানে আমাকে করেছ গ্রহণ,
দিয়েছ নির্ব্বাসন সজ্ঞানে,
নির্ব্বাসন দণ্ড ত দাও নি,
করেছ বহিষ্কার অজ্ঞাতসারে।

তবু জানি রয়েছি তোমার সহজ বিস্মৃতির ভিতর,
আমারি বাণী কর প্রচার আত্মোক্তিতে।
তোমার প্রতিদিনের গ্রহণ বর্জ্জনের মধ্যেই আছি আমি,
নাই মিলনের সুখ, নাই বিরহের বেদনা।

তোমার বৈশাখী আকাশে অদৃশ্য বাষ্পজাল আমি,
শোষন করে নিচ্ছ আমাকে অহর্নিশ।
তবু জানি নিঃসংশয়ে একদিন আস্‌বে আষাঢ়,
পুঞ্জ মেঘে দেব ঢেকে তোমার সুনীল শূন্যতা,
অবাক হয়ে দেখ্‌বে আমার নবজলধর কান্তি।

তখন ডাক্‌বে আমাকে তোমার দগ্ধবুকে,
আস্‌ব নেমে অজস্র ধারায় তোমারি ডাকে।
তখন বুঝ্‌বে আমি ভরেছিলাম তোমার শূন্যতা,
তখন চাইবে আমাকে বাসনার বেদনায়,
দেখ্‌বে আমার বিদ্যুৎ, শুন্‌বে বজ্রনাদ, পাবে স্পর্শাবগাহন।

সমাপ্তির সুর

হেমচন্দ্র বাগচী

বড় ভালোবেসেছিনু, হে ধরণী, তোর মায়ালোক
তোর মুগ্ধ প্রেমচ্ছবি, হাসিভরা পরিচিত চোখ
বড় ভালো লেগেছিল; বিষণ্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে
চিত্ত মোর পূর্ণ হ'লো অব্যক্ত গভীর হাহাকারে
অতিদূর বেদনার লাগি'। এ জীবনে বহুবার
আত্মার অতল তলে শুধায়েছি প্রিয়েরে আমার
'আমার গভীর প্রেম সে কি সত্য নয়?'

শুনিয়াছি
জীবন-সাগর-তটে অনন্ত মৃত্যুর কাছাকাছি
প্রশ্নের উত্তর মোর—শুনিয়াছি প্রেম মৃত্যুহীন
জন্ম হ'তে জন্মান্তরে সে প্রেমের কে শুধিবে ঋণ?
দেখিয়াছি কতদিন এ নীরব অন্তরের মাঝে
সীমাতীত রূপলোক বেদনার অপরূপ সাজে।
সেথা বসি' ধ্যানাসনে শুধায়েছি প্রিয়েরে আমার—
কহ তুমি সত্য করি' মোর প্রেম অনন্ত অপার
সে কি শুধু গৃহকোণে মধ্যাহ্নের কপোত-গুঞ্জন?
সে কি শুধু রাগারুণ চুম্বনের অলস ভুঞ্জন?

আমি ত করেছি পান যৌবনের তপ্ত দ্রাক্ষারস,
পীতশেষ পাত্র মোর পান করো ব্যাকুল বিবশ—
যদি তাহে কোনোদিন অন্ধকার শর্ব্বরীর শেষে
মোর নাম, হাসি মোর, মোর দৃষ্টি উঠে যদি ভেসে ;
সেদিন চিনিবে মোরে তরল অশ্রুর বরষণে,
সেদিন কবিরে তব ক্ষণে-ক্ষণে পড়িবে যে মনে
কদম্ব-কেশর-ঝরা বরষার বনপথ-পারে।
সেইদিন প্রেম তব, মহেন্দ্রের তোরণের দ্বারে
লিখিবে লিখন তার. ইন্দ্রানীর কপোল ঘেরিয়া
নামিবে অশ্রুর বাষ্প, ভাবিবে সে উদাসিনী হিয়া
কত সে উদার প্রেম—ধরণীর মুগ্ধ শিশু প্রাণ
তার মনে কোথা হ'তে এল দূর সমুদ্রের গান
অসীম সুন্দর !
এমনি ভাবিনু কত কাল রাতে
অন্ধকার মানসলোকের প্রান্ত হ'তে ; যে-আঘাতে
আকাশের বক্ষ চিরি' বাহিরায় বিদ্যুৎ-রুধির
যে-আঘাতে উদ্বেলিত বক্ষতল শ্যামা ধরণীর
তেমনি আঘাত লেগে ফুটে মোর মানস কুসুম
অতি দূর স্বর্গ-অভিলাষী। তাই চক্ষে নাই ঘুম,

সহিতে পারে না তাই রাত্রি মোর বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শঙ্কার শিহরে কভু, কভু হয় উতলা উদাস
বেদনায় বিবর্ণ মলিন। তাই মোর প্রাণ ধায়
বহু দূর সিন্ধুপারে অজ্ঞাত নদীর কিনারায়,
যেখানে গাহে না পাখী, প্রভাতের আলো নাহি আসে,
শুধু উঠে চিতাধূম, শ্মশানের শবগুলি ভাসে
সিন্ধু-শকুনের দল উড়ে যায় দিগন্তের পারে—
সূর্য্যের চিতার পানে ছায়াম্লান বনের ওপারে।
সেথা কারা গাহে গান অদৃশ্য সে ছায়া-শরীরিণী,
মোর মনে জাগে শুধু ব্যথাময়ী কাল-প্রবাহিনী
প্রচণ্ড আবর্ত্তে তার চেয়ে আছি—পড়ে না নিমেষ।
প্রেম—সে কি সত্য নয় ? এবারের মত সবি শেষ ?

কবিতায় দুর্ব্বোধ্যতা

ভালো কবিতার লক্ষণ সম্বন্ধে কবি, দার্শনিক, অধ্যাপক, পেশাদার সমালোচক, প্রকাশকের বিজ্ঞাপন-লেখক, প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন সময়ে বহু বিভিন্ন উক্তি করেছেন ; কিন্তু পাঠকের বোধগম্যতার উপর কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে, এমন কথা কখনো বোধ হয় শোনা যায়নি। কবিতা সম্বন্ধে যত উদ্ভট ও অনর্থক কথা এ-পর্য্যন্ত বলা হয়েছে, পৃথিবীর আর-কোনো বিষয়ে সে-রকম হয়েছে কিনা জানিনে ; তবু কাব্যজিজ্ঞাসুদের সমর্থনে এ-কথা অন্তত বলা হোক্ যে সাধারণ মানুষ সাধারণ ভাবে পড়ে' বুঝতে না-পারলেই কবিতা হ'লো না—কিম্বা, ভালো কবিতা তা-ই, সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে পড়ে'ই যা বুঝতে পারে—এমন স্থূল মূঢ়তা কোনো অধ্যাপকের উচ্চ আসন থেকেও কখনো ধ্বনিত হয়নি। বস্তুত, কবির সঙ্গে তাঁর পাঠকের সম্বন্ধ কাব্যজিজ্ঞাসার অংশ হিসেবে বিশেষ গ্রাহ্য হয়নি—অন্তত, অত্যাধুনিক মনোবিশ্লেষণী যুগের আগে পর্য্যন্ত হয়নি। স্বয়ং কবিরা সম্ভবত পাঠক-সম্বন্ধে চিরকালই মনে-মনে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে' এসেছেন—সে-অবজ্ঞা যদি পাঠকের গ্রহগুণে কখনো সরূপ হয়, তাহ'লেই বেশি। ল্যাণ্ডরের উদ্ধত গর্ব্বের ভাব সকল কবির মধ্যে স্পষ্ট উচ্চারিত না-হ'লেও, ঔদ্ধত্যটুকু বাদ

দিয়ে কবির মনের কথা সেটাই। তার প্রকাশ আছে মিলটনে, আছে ভবভূতির বিখ্যাত ও অতি-উদ্ধৃতিতে প্রায়-অসারীকৃত শ্লোকে, আছে আমাদের রবীন্দ্রনাথে, যে-কোনো মহৎ কবির রচনা থেকে একটু কল্পনা প্রয়োগ করলে এ-মনোভাব উদ্ধার করা শক্ত নয়। আমার যা বলবার তা তো আমি বলে' গেলাম, এখন তোমরা পড়ো আর না-ই পড়ো, বোঝো আর না-ই বোঝো : ভাবটা অনেকটা এইরকমের।

অথচ কবি যখন তাঁর রচনা বাক্সে বন্ধ করে' কি তার প্রচার দু' চারটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন না, তাঁর রচনা যখন প্রকাশিতই হয়, এবং কাগজের উপর যারা কলম চালায়—কবি হোক্, অকবি হোক্, সকলেরই মনে যখন অস্বীকার্য্য যশোলিপ্সা আছে, তখন পাঠকের একটা দিক মানতে হয় বইকি। সকল পাঠকই মূঢ় নয় ; এবং ঘর্ম্মায়মান কবিনামলোভীর চাইতে (এ-শ্রেণীটি সব দেশে সব সময়েই অনিবার্য্য) একজন বুদ্ধিমান ও রসজ্ঞ পাঠকের সামাজিক মূল্য অনেক বেশি। পাঠকের বোধগম্য হওয়া কবিতার কর্ত্তব্য নয় : কিন্তু এটা দেখা যে যথার্থ কবিতা—যত বিচিত্র রীতি ও প্রকৃতিরই হোক্ না—যথার্থ রসজ্ঞের মর্ম্মস্পর্শ করতে শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়নি—অবিশ্যি নিতান্ত ব্যক্তিগত রুচির খাতিরে কিছু গলতি ধরতেই হবে।

শেষ পর্য্যন্ত হয়নি, বললাম : কেননা কিছুকালের জন্যে ব্যর্থ হয়েছে, এ-উদাহরণের জগতে অভাব নেই। চলতি ফ্যাসানের রঙ আমাদের বুদ্ধিতে রুচিতে রসবোধে এমন পাকা হ'য়ে লাগবে যে তা কাটিয়ে উঠে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বধর্ম্মী নতুন কবিকে গ্রহণ করতে অসাধারণ মনই পারে—এবং

নামেই প্রকাশ, অসাধারণত্ব বিরল। পাঠকের সঙ্গে কবির এ-সংঘাত ঘটেছে প্রতিযুগে দেশে-দেশে। কিন্তু এই নজিরের জোরে উৎকট উন্মত্ততাও কখনো-কখনো কবিতা হবার হাস্যকর দাবি করেছে, আজকালকার দিনে বিশেষ করে' এ-দৃষ্টান্তের অভাব বোধ হয় নেই। কেননা উন্মত্ততা প্রতিভার মতই অ-সাধারণ, এ-দুয়ে ভেদরেখাও সব সময় স্পষ্ট-নির্ণীত নয়; এবং প্রতিভাবানকে উন্মাদ কি উন্মাদকে প্রতিভাবান বলে' ভুল করা সব সময়েই সম্ভব। এখন, এমন যদি কোনো নতুন কবি আসেন, যাঁর রচনা আমরা 'বুঝতে' পারছি না, সেটা কি আমাদের মূঢ়তার প্রমাণ, না কবির নগণ্যতার?

প্রকৃত ঘটনার ক্ষেত্রে, অবিশ্যি,এ-সমস্যার মীমাংসা করেছে সময়। আমরা জানি, অনেক মুখ্য কবির প্রথম আবির্ভাব সমসাময়িক ব্যঙ্গে ও লাঞ্ছনায় কণ্টকিত; কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মহত্ত্বের উপলব্ধি মৃত্যুর পূর্ব্বে ছাড়া হয়নি। বাধা হয়েছে অবিশ্যি সমসাময়িক রুচির দৌরাত্ম্য, যার সঙ্গে কবির স্বকীয়তা মেলেনি। চলতি সাহিত্যিক ফ্যাসানে শাসিত, আমরা নব প্রতিভাকে 'বুঝতে' পারিনে; বলে' ফেলি—এর মানে হয় না।

এখন বলতে গেলে, কবিতা সম্বন্ধে 'বোঝা' কথাটাই অপ্রাসঙ্গিক। কবিতা আমরা 'বুঝিনে'; কবিতা আমরা অনুভব করি। কবিতা আমাদের কিছু 'বোঝায়' না; স্পর্শ করে, স্থাপন করে একটা সংযোগ। ভালো কবিতার প্রধান লক্ষণই এই যে তা 'বোঝা' যাবে না, 'বোঝানো' যাবে না। যে-কবিতা বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বোঝা যায় তার উচ্চতম রূপ আঠারো শতকের ইংরিজি কবিতা: তাতে আর সবই আছে, কবিতা নেই। যে-কবিতা পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে নিতান্তই বোঝা গেলো, সে-কবিতা লংফেলো মিসেস

হেমান্সদের, ইস্কুলের পাঠ্যকেতাব তার পরম গৌরবময় কবর। যা 'বোঝবার' জিনিষ, বোঝাবার সঙ্গে-সঙ্গেই তা ফুরিয়ে যায়, কিছু বাকি থাকে না। কিন্তু বুদ্ধি-অতীত বুদ্ধি-পলাতক যে-বিরাট উদ্বৃত্ত, যে-জলন্ত ভাবমণ্ডল—যেখানে অপরূপ ধ্বনির আর অলৌকিক ইঙ্গিতের সীমাহীনতা—কবিতা তো তা-ই, তা ছাড়া আর কী? সেটা 'বোঝা' যায় না, 'বোঝানো' যায় না; যে নিজে না দ্যাখে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় না তাকে। রামকৃষ্ণ পরমহংস বর্ণিত ঈশ্বর-উপলব্ধির মত এ-উপলব্ধি ও অসংবেদনীয়।

সুতরাং এটা মোটেও আশ্চর্য্য নয়, যেপৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রথমটায় দুর্ব্বোধ্য কি অর্থহীন বলে' তিরস্কৃত হবে। আশ্চর্য্য যেটা, সেটা এই যে দুর্ব্বোধ-অভিহিত কবিতা প্রায় ক্ষেত্রেই নিতান্ত সহজ ভাষায় সহজ রীতি; এবং অন্যপক্ষে, কঠিন শব্দ বিন্যাসে অলঙ্কার-জটিল কবিতা সম্বন্ধে দুর্ব্বোধ্যতার অপবাদ বড় শোনা যায় না। মেঘনাদ-বধ কাব্য পড়তে শিক্ষিত লোককেও একাধিকবার অভিধান খুলতে হয়; কিন্তু এ-কথা কেউ বলে না যে ও-কাব্য বোঝা যায় না। গীতাঞ্জলিতে এমন কথা প্রায় নেই যা আমরা আমাদের প্রতিদিনকার আলাপে ব্যবহার করিনে, কিন্তু গীতাঞ্জলি যে হেঁয়ালি এ-কুসংস্কার দেশে মরতে-মরতেও এখনো টিঁকে আছে। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের শত্রুদলের প্রধান প্রতিপাদ্যই ছিল এই যে তাঁর কবিতার 'মানে হয় না'; এবং এই ধারণা তৎকালীন পাঠকদের প্রচুর করতালিও পেয়েছিলো। এই সমালোচকদের মধ্যে পণ্ডিত ছিলেন, ছিলেন রসগ্রাহী, কিন্তু তাঁদের চৈতন্য আচ্ছন্ন ছিলো সেই কাব্যাদর্শে, যাতে তখন পর্য্যন্ত বাঙলা কবিতা রচিত হতো। তাঁদের মনে ছিলো মহাকাব্যের মহিমা, তাঁদের মনে

বাজতো নব রসের কনসার্ট, বাজতো নিছক ছন্দের, অনুপ্রাসের ঝঙ্কার, ওস্তাদ কারিগরিকে তাঁরা কবিত্বশক্তির সঙ্গে প্রায় অভিন্ন করে' দেখতেন। ভারতচন্দ্রের সমস্ত জটিল মারপ্যাঁচ, তাই, অতি সহজবোধ্য ; মধুসূদনের দীর্ঘ বিজড়িত বাক্য-বিন্যাসে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই ; দুর্ব্বোধ্য কেবল সরলতা, স্বতঃস্ফূর্ত্ততাই অর্থহীন। তা তো হ'তেই হবে ; কেননা কবিতার কঠিন শব্দ-চয়ন ও জটিল বাক্য-বিন্যাসেই তাঁরা অভ্যস্ত ; সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই সঙ্গত, সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ততাই অপ্রাকৃত বিকৃতি।

কিন্তু হয়-তো সমসামায়িক রুচির কথাই কেবল নয়। গীতাঞ্জলি যে-শ্রেণীর রচনা, যা বলা যায় বিশুদ্ধ কবিতা, যেখানে কথাগুলো রূপক-চিহ্ন মাত্র, পরস্পর-যোজনায় উজ্জ্বল সেতু রচনা করে পাঠকে ও কল্পনার অনির্দ্দেশ্য অপরিসীম তীরপ্রান্তে ; এ ধরণের কবিতা অধিকাংশ পাঠকের মধ্যে সমাদৃত (ফ্যাসানের খাতিরে ছাড়া) হ'তেই পারে না। কবিতা লিখতে হ'লে যেমন বিশেষ একটি ক্ষমতা নিয়ে জন্মাতে হয়, বিশুদ্ধ কবিতা উপভোগ করতে হ'লেও তেমনি একটী জন্ম-গত ক্ষমতার প্রয়োজন। অধিকাংশ পাঠকই চায় যে কবিতা হবে স্পষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট, সঙ্কীর্ণ একটা বিষয়ে আবদ্ধ, যা ধরা-ছোঁয়া যায়, যা 'বোঝা' যায়—যেমন করে' ও মনের যে-বৃত্তির সাহায্যে আমরা বুঝি গণিত কি দার্শনিক প্রবন্ধ—অবিশ্যি তার সঙ্গে থাকবে ছন্দের সুখদ ঝঙ্কার। মানে, কবিতা গ্রাহ্য হয় কর্ণেন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে। কিন্তু এ-কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে কবিতা যত অল্প 'বোঝা' যাবে ততই তা উচ্চতর শ্রেণীর এবং বিশুদ্ধ কবিতায় বোঝাবুঝির কোনো বালাই-ই নেই। এমন যদি হয় যে কেউ জিজ্ঞেস করে 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' কি 'Tiger !

Tiger ! Burning Bright' করিবার 'অর্থ' কী, তাহ'লে তৎক্ষণাৎ এ-কথাই বলে' উঠতে হয় : 'অর্থ ! অর্থ আবার কী !' সত্যি-সত্যি ও ছাড়া কোনো উত্তর নেই। অবিশ্যি অধ্যাপকদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করছি না : তাঁরা অধ্যাপক, তাঁরা সবই পারেন।

সমাজপতি প্রমুখ ধুরন্ধরদের অযথা অপবাদ দিয়ে লাভ নাই ; রবীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত কাব্যাদর্শ ও কাব্য-রীতির সঙ্গে তাঁদের একবারেই পরিচয় ছিলো না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যখন দেশে সর্ব্বব্যাপী, যখন পরবর্ত্তী কবিগোষ্ঠী তাঁরই ইস্কুলে প্রাথমিক পাঠ নিয়েছেন, মানে—ঠিক এই সময়েও বঙ্গ-কবিতার এই অপেক্ষাকৃত পরিণতির যুগেও—এমন পাঠকের নিশ্চয়ই অভাব নেই যার কাছে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কাব্য-রচনা 'অর্থহীন' ঠেকে ঠিক যেন 'বোঝা' যায় না, কেমন অস্পষ্ট ঠেকে, একটা হাতল পাওয়া যায় না যেটা আঁকড়ে কবিতাটাকে বাগানো যায়। বাংলাদেশে কবিতা যাঁরা পড়েন, তাঁদের মধ্যে মনে-মনে — কি কখনো-কখনো প্রশংসনীয় প্রকাশ্যতায়—রবীন্দ্রনাথের চাইতে দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ কি নজরুল ইসলামকে অনেক বেশি পছন্দ করেন। কেননা শেষোক্ত কবিদের রচনার একটা নির্দ্দিষ্ট 'বিষয়' আছে, তা স্পষ্ট ও স্পর্শসহ, তার বোধগম্যতা বুদ্ধিসাপেক্ষ। আমার বক্তব্যের আর-একটা মস্ত প্রমাণ এই যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আমাদের দেশে কথা ও কাহিনীর প্রচারই বহুলতম : কেননা সেখানে আছে সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়, আছে বোধগম্যতা।

কিন্তু এটাও বিবেচ্য যে গীতাঞ্জলি শ্রেণীর রচনা কখনো 'কঠিন' বলে' আখ্যাত হয় না। অমন অপরূপ সরল বলে'ই সাধারণ বোধশক্তিকে তা

লঙ্ঘন করে' যায়। ভাল কবিতা কখনো-কখনো দুরূহ ও কঠিন হয়, হয় একাধিক কারণে। মিলটনের মত পণ্ডিতের রচনায় এমন বহুল আনুষঙ্গিকতা থাকতে বাধ্য যে টীকা প্রভৃতির সাহায্য ছাড়া সমস্তটা উদ্ধার করতে হ'লে মিলটনের মতই পণ্ডিত হ'তে হয়। তারপর ব্রাউনিঙের দুরূহতার জন্যে দায়ী তাঁর অতি-ঘনীভূত বক্র রচনা-রীতি; সেই রীতির মধ্যে একবার প্রবেশ করতে পারলে ব্রাউনিঙের দুরূহতা অনেকাংশেই দূর হয় এটা প্রত্যক্ষ দেখা গেছে। ও-রকম না-লিখে ব্রাউনিঙের উপায় ছিলো না, ঐ রীতিটাই ব্রাউনিঙ। কিন্তু আর এক রকমের দুরূহতা হ'তে পারে যেটা ইচ্ছাকৃত ও মস্তিষ্কপ্রসূত। গোলকধাঁধাঁর মত ঘোরেল একটা কৃত্রিম রীতি উদ্ভাবন করা যায়। আর-কোনো উপায় না থাকলে প্রশংসনীয়—কিন্তু কী নিষ্ফলা—শ্রম-দ্বারা এমন শব্দ প্রয়োগ করা সম্ভব, অভিধানেও যা পাওয়া যায় না। বলেছি, শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণই এই যে তা 'বোঝা' যাবে না; কিন্তু যেটা বোঝা যাচ্ছে না সেটাই শ্রেষ্ঠ নয়। যথেষ্ট মাথা খাটিয়ে এমন কবিতা তৈরি করা সম্ভব, যা নিতান্ত দুরূহ, এবং যার মধ্যে দুরূহতা ছাড়া আর-কিছুই নেই। দুরূহতার চেহারা সম্ভ্রমের উদ্রেক করে, এবং সেটা ভাঙ্গিয়ে কিছু-কাল কবি-খ্যাতি উপভোগ করাও বিচিত্র নয়। ভালো কবিতা কখনোই 'বোঝা' যাবে না এ-কথা বলবার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা যেন এই কৃত্রিমের স্পর্দ্ধা সম্বন্ধে সতর্ক থাকি।

কবিতা

প্রথম বর্ষ পৌষ, ১৩৪২ দ্বিতীয় সংখ্যা

ছুটি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ
কল্যাণীয়েষু

আশ্বিনে সবাই গেছে বাড়ি;
তাদের সকলের ছুটির পলাতকা ধারা মিলেছে
আমার ছুটির বিস্তৃত মোহানায় এসে
এই রাঙামাটির দীর্ঘ পথপ্রান্তে।
আমার ছুটি ব্যাপ্ত হয়ে গেল
দিগন্তপ্রসারী বিরহের জনহীনতায়;
তার তেপান্তর মাঠে কল্পলোকের রাজপুত্র
ছুটিয়েছে পবন-বাহন ঘোড়া
মরণ সাগরের নীলিমায় ঘেরা
স্মৃতিদ্বীপের পথে।
সেখানে রাজকন্যা চিরবিরহিণী
ছায়াভবনের নিভৃত মন্দিরে।
এমনি করে আমার ঠাঁইবদল হোলো
এই লোক থেকে লোকাতীতে॥

আমার মনের মধ্যে ছুটি নেমেছে
যেন পদ্মার উপর শেষ শরতের প্রশান্তি।

বাইরে তরঙ্গ গেছে থেমে
গতিবেগ রয়েছে ভিতরে।
সাঙ্গ হোলো দুই তীর নিয়ে
ভাঙন-গড়নের উৎসাহ।
ছোটো ছোটো আবর্ত্ত চলেছে ঘুরে ঘুরে
আনমনা চিত্তপ্রবাহে ভেসে যাওয়া
অসংলগ্ন ভাবনাগুলোর মতো।
সমস্ত আকাশের তারার ছায়া
আঁচলে ভরে নেবার অবকাশ পেয়েছে সে
রাত্রের অন্ধকারে॥

মনে পড়ে অল্পবয়সের ছুটি ;
তখন হাওয়া-বদল ঘর থেকে ছাদে ।
লুকিয়ে আসত ছুটি, কাজের বেড়া ডিঙিয়ে,
নীল আকাশে বিছিয়ে দিত
বিরহের সুনিবিড় শূন্যতা,
শিরায় শিরায় মিড় দিত তীব্র টানে
না-পাওয়ার না-বোঝার বেদনায়,
এড়িয়ে যাওয়ার ব্যর্থতার সুরে ।

সেই বিরহগীতগুঞ্জরিত পথের মাঝখান দিয়ে
কখনো বা চমকে চলে গেছে
শ্যামলবরণ মাধুরী
চকিত কটাক্ষের অব্যক্ত বাণী বিক্ষেপ ক'রে,
বসন্তবনের হরিণী যেমন দীর্ঘনিশ্বাসে ছুটে যায়
দিগন্তপারের নিরুদ্দেশে॥

এমনি করে' চিরদিন জেনে এসেছি
মোহনকে লুকিয়ে দেখবার অবকাশ এই ছুটি
অকারণ বিরহের নিঃসীম নির্জ্জনতায়॥

হাওয়া বদল চাই—
এই কথাটা আজ হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল
ঘরে ঘরে হাজার লোকের মনে।
টাইম-টেবিলের গহনে গহনে
ওদের খোঁজ হোলো সারা,
সাঙ্গ হোলো গাঁঠরি বাঁধা,
বিরল হোলো গাঁঠের কড়ি।
এদিকে, উনপঞ্চাশ পবনের লাগাম যাঁর হাতে
তিনি আকাশে আকাশে উঠেছেন হেসে

ওদের ব্যাপার দেখে।
আমার নজরে পড়েছে সেই হাসি,
তাই চুপচাপ এই চাতালে বসে আছি
কেদারাটা টেনে নিয়ে॥

দেখলেম বর্ষা গেল চ'লে
কালো ফরাসটা নিল গুটিয়ে।
ভাদ্রশেষের নিরেট গুমটের উপরে
থেকে থেকে ধাক্কা লাগল
সংশয়িত উত্তরে হাওয়ার।
সাঁওতাল ছেলেরা শেষ করেছে কেয়াফুল বেচা ;
মাঠের দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে গোরুর পাল,
শ্রাবণ ভাদ্রের ভূরিভোজের অবসানে
তাদের ভাবখানা অতি মন্থর ;
কী জানি, মুখ-ডোবানো রসালো ঘাসেই তাদের তৃপ্তি,
না, পিঠে কাঁচা রৌদ্র লাগানো আলস্যে।

হাওয়া বদলের দায় আমার নয় ;
তার জন্য আছেন স্বয়ং দিক্‌পালেরা
রেলোয়ে ষ্টেশনের বাইরে,
তাঁরাই বিশ্বের ছুটিবিভাগে রসসৃষ্টির কারিগর।
অস্ত আকাশে লাগল তাঁদের নতুন তুলির টান
অপূর্ব্ব আলোকের বর্ণচ্ছটায়।
প্রজাপতির দল নামালেন
টগরের রৌদ্রে ঝল্‌মল্ ফুলভরা ডালে,
পাতায়-পাতায় যেন বাহবাধ্বনি উঠেছে
ওদের হালকা ডানার এলোমেলো তালের রঙীন নৃত্যে।
আমার আঙিনার ধারে ধারে এতদিন চলেছিল
এক সার জুঁই বেলের ফোটা-ঝরার ছন্দ,
সঙ্কেত এল, তারা সরে পড়ল নেপথ্যে;
শিউলি এল ব্যতিব্যস্ত হয়ে;
এখনো বিদায় মিল্‌ল না মালতীর।
কাশের বনে লুটিয়ে পড়েছে শুক্লাসপ্তমীর জ্যোৎস্না,—
পূজার পার্ব্বণে চাঁদের নূতন উত্তরী
বর্ষাজলে ধোপ দেওয়া॥

আজ নি-খরচার হাওয়া- বদল জলেস্থলে।
খরিদদারের দল তাকে এড়িয়ে চলে গেল
দোকানে বাজারে।
বিধাতার দামী দান থাকে লুকোনো
বিনা দামের প্রশ্রয়ে,
সুলভ ঘোমটার নিচে থাকে
দুর্লভের পরিচয়।
আজ এই নি-কড়িয়া ছুটির অজস্রতা
সরিয়েছেন তিনি ভিড়ের থেকে
জনকয়েক অপরাজেয় ফুঁড়ে মানুষের প্রাঙ্গণে।
তাদের জন্যেই পেতেছেন খাষদরবারের আসর
তাঁর আম-দরবারের মাঝখানেই,—
কোনো সীমানা নেই আঁকা।
এই ক'জনের দিকে তাকিয়ে
উৎসবের বীণকারকে তিনি বায়না দিয়ে এসেছেন
অসংখ্য যুগ থেকে॥

বাঁশি বাজল।
আমার দুই চক্ষু যোগ দিল
কয়খানা হালকা মেঘের দলে।
ওরা ভেসে পড়েছে নিঃশেষে মিলিয়ে যাবার খেয়ায়।
আমার মন বেরোলো নির্জ্জনে আসন-পাতা
শান্ত অভিসারে,
যা-কিছু আছে সমস্ত পেরিয়ে যাবার যাত্রায়॥

আমার এই স্তব্ধ ভ্রমণ হবে সারা,
ছুটি হবে শেষ,
হাওয়া-বদলের দল আসবে ভিড় করে,
আসন্ন হবে বাকি-পড়া কাজের তাগিদ।
ফুরোবে আমার ফিরতি-টিকিটের মেয়াদ,
ফিরতে হবে এইখান থেকে এইখানেই,
মাঝখানে পার হব অসীম সমুদ্র॥

শুক্লাসপ্তমী আশ্বিন
১৩৪২

কোকিল, ওগো কোকিল

বুদ্ধদেব বসু

কোকিল, ওগো কোকিল, তুমি ডাকছো
দুপুরবেলাকে চম্‌কে দিয়ে, আর-বছরের মত,
যখন দিনের শরীর থর্‌থর্ করে' কাঁপতো
একজনের অভাবে।

কোকিল, ওগো কোকিল, তুমি তেমনি
ডাকছো রাত্রি ভরে' ঘুমের ফাঁকে-ফাঁকে—
যখন সমস্ত রাত্রি জোয়ারের মত ফেনিয়ে উঠতো
ব্যথায়, আর প্রার্থনায়।

সে যখন এলো বর্ষায়, তুমি কোথায়,
কোথায় ছিলে, কোকিল, যখন তার বুকের
ঢেউয়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে আমি বলতে পারলুম,
'আর ভয় নেই'।

কোথায় ছিলে তুমি শীতের দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ রাত্রিতে
কোথায় ছিলে, কোকিল, যখন উন্মথিত অন্ধকারের
বুক চিরে বেরিয়ে এলো চিরকালের লাল পদ্ম
অপরূপ, জ্যোতির্ময়।

আবার বসন্ত এলো, গাছে-গাছে সবুজের স্রোত ;
কিন্তু আমি ক্লান্ত, আমি নিঃসঙ্গ, দিন-রাত্রির নিষ্পেষণে
রুদ্ধশ্বাস ;— আর তুমি থেকে-থেকে ডেকে উঠেছো
কোকিল, ওগো কোকিল !

ওগো কোকিল, আর কখনো কি তোমার সময় হয় না ?
আমার দিন যে ফুঁপিয়ে ওঠে চাপা কান্নায়,
আর স্মৃতির বুনো হাতির পাল আমার রাত্রিকে
মাড়িয়ে ছিঁড়ে দিয়ে যায়।

আমার দিন দীর্ঘ, আমার দিন যে কাটে না,
আমার রাত্রির শরীর মুচড়িয়ে ফুঁসিয়ে ওঠে
আহত সাপের মত—আর তুমি থেকে-থেকে ডেকে উঠছো
স্বরের তীব্র বিদ্যুতে !

কোকিল, ওগো কোকিল, তুমি কি বলতে পারো
কোথায় এই কান্নার শেষ, কোন্ দিগন্তে ?
বলো, সেখানে কি কাঁপছে চিরকালের কল্পনার
জ্যোতির্ময় ইন্দ্রধনু ?

দয়াময়ী

বুদ্ধদেব বসু

আমার দুঃখ দেখে দয়া হয় কি তোমার
দয়াময়ী মহিলা ?
তাই কি আমার কাছে আসতে চাও—
দয়াময়ী মহিলা।

থাক্, দাঁড়াও ওখানেই, মুখ ফেরাও,
করুণাময়ী !
মরতে দাও আমাকে একা, কিন্তু তোমার

ঐ দয়ার দেবীত্বের লীলা
তা থেকে আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও,
ফিরে যাও, হে দেবী, ফিরে যাও
যেখানে তোমার স্বরক্তের শাখা-প্রশাখা,

তোমার উৎস, তোমার মূল
যেখান থেকে দয়া করে' এসেছিলে
আমাকে একা দেখে, ভালোবেসে,
আমাকে ভালোবেসে—কী ভুল !

কে চায় তোমার ভালোবাসা, কে চায় !
তোমার ঐ সাদা দয়ার ভালোবাসা কে চায়, বলো !
নিয়ে যাও, ফিরিয়ে নিয়ে যাও, হে দেবী-অতিথি—
কেঁদো না, ঐ তোমার চোখের ছলোছলো

করুণ দৃষ্টি অনেক মেরেছে আমাকে।
কাঁদতে-কাঁদতে তুমি এসেছিলে—কেন এলে ?
অত কান্নার দাম আমার মধ্যে নেই,
সত্য করে' বলি।

এখন আর কেঁদো না, যাও ; ফিরে-ফিরে
আর তাকিয়ো না ; আমিও
অনেক কেঁদেছি, অনেক ; বুক ভেঙে গেছে ;
তোমার করুণার অমিয়

সে-ফাটা জোড়া লাগবে না ; যাও তুমি
যেখানে তোমার শান্তির ছায়া,
তোমার জন্ম-তরুর মূল আর শাখা,
আমার রাস্তায় অনেক কাঁটা, অনেক আঁকাবাঁকা।

আমার মধ্যে শান্তি পাবে না, এ তো জানতেই,
আমি ক্ষুধিত, আমি অস্থির, আমি নিষ্ঠুর,
চীৎকার করে' আমি চাই, চাই, চাই,
হয়-তো কোন্‌দিন ভেঙে ফেলতুম তোমার মধুর

দেবী-প্রতিমা, লোকে ছি-ছি বলতো। যাক্, ভালোই হ'লো
এ- খেলা যে ভাঙলো, ভালোই হ'লো।
এবার তো দেখলে আমার চরম নগ্নতা—
কী হিংস্র আমি, নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর!

নির্লজ্জের মত চেয়েছিলুম তোমাকে
সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র তুমি,
আর-কেউ নয়, আর-কিছু নয়, শুধু তুমি,
তুমি!

আর তুমি কি চাও আমাকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়ে,
কোনোখানে একটু খোঁচ থাকবে না, একটু চিড়।
নিজেকে হাজার টুকরো করে' দেবো বিলিয়ে

যত কিছু তুমি ভালোবাসো সবার মধ্যে,
নানা আয়োজনে, নানা অনুষ্ঠানে,
রীতিপালনে, নিয়মরক্ষায়। সবই সুন্দর,

ছন্দের সুষমায় গাঁথা!—নিতে আমাকে কুড়িয়ে,
ভাঙা টুকরোগুলো ভালোবাসার সুতো দিয়ে গেঁথে।
ক্ষমা করো আমাকে—অন্য-সব ভালোবাসা আমার গেছে ফুরিয়ে

তোমাকে ভালোবাসে। নির্ব্বোধের মত চেয়েছিলুম তোমাকে
সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে'—তুমি আমার, আমার!
ছাখো! এ-ই তো আমার ভালোবাসা, যা আমি দিতে পারি,

এতে উন্মত্ততা, এতে সর্ব্বনাশ। এ কি তোমার সইবে?
আমার চুম্বনের ধারে তুমি কি ছিঁড়ে যাবে না?
ভয় নেই—আমিও ছিঁড়ে গেছি আমার বাসনার ধারে—

ভয় নেই তোমার, তুমি যাও
যাও, ছলোছলো চোখে ফিরে-ফিরে চেয়ো না,
একা মরতে দাও আমাকে।

জানি তোমার ছলোছলো চোখ, জানি কান্না !
আমারও বুক কান্নায় ভেঙে গেছে।
এখন আমার ভাঙা-চোরা টুকরোগুলো কুড়িয়ে

তুমি কি দয়া দিয়ে বাঁচাতে চাও ? যাও, এগিয়ে যাও,
হাওয়ায় তোমার কালো চুল দাও উড়িয়ে
ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাক্; তোমার বুকের ঠাণ্ডা দয়া।

হও নিষ্ঠুর : তোমার ভালোবাসা যাক্ ফুরিয়ে,
ভয় কোরো না। তবু হোক্ তোমার বুক আগুনের উৎস,
আমাকে পোড়াও আগুনের ঝরনায়, যদি পারো,
তোমার ঘৃণার চাবুকে মারো আমাকে, মারো,

হও স্ত্রী, হও স্ত্রীলোক—দয়ার শ্বেত দেবী নয়,
নয় ছন্দের সুষমায় ঢালা মহিলা !
অনেক দেখেছি তোমার দয়া-শ্বেত ভালোবাসার লীলা—
আর নয় !

বিস্মৃতি

সমর সেন

ভুলে-যাওয়া গন্ধের মতো
কখনো তোমাকে মনে পড়ে।
হাওয়ার ঝলকে কখনো আসে কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত আভাস।
আর মেঘের কঠিন রেখায়
আকাশের দীর্ঘশ্বাস লাগে।
হলুদ রঙের চাঁদ রক্তে ম্লান হ'লো,
তাই আজ পৃথিবীতে স্তব্ধতা এলো,
বৃষ্টির আগে শব্দহীন গাছে যে কোমল, সবুজ স্তব্ধতা আসে।

দুঃস্বপ্ন

সমর সেন

মাঝে-মাঝে তোমার চোখে দেখেছি
বাসনার বিষণ্ণ দুঃস্বপ্ন ;
তার অদৃশ্য অন্ধকার প্রতি মুহূর্তে
আমার রক্তে হানা দেয় ;
আমার দিনের জীবনে তোমার সেই দুঃস্বপ্ন
এনেছে পারহীন অন্ধকার ।

মাঝে-মাঝে ঘুম ভেঙে যায়
মধ্যরাত্রে ।—
বাইরে এসে দেখি
তারায় ছেয়েছে বর্ণহীন আকাশ—
আর হাওয়া দিয়েছে বিপুল শূন্যতা থেকে ;
সে-হাওয়ায় শুধু যেন শুনি,
কান পেতে শুনি—
কোন্ সুদূর দিগন্তের কান্না ;
সে-কান্না যেন আমার ক্লান্তি,
আর তোমার চোখের বিষণ্ণ অন্ধকার ।

অন্ধকারের মতো ভারী তোমার দুঃস্বপ্ন,
তোমার দুঃস্বপ্ন অন্ধকারের মতো ভারী ।

ইতিহাস

সমর সেন

তোমাকে বললাম—এসো,
তোমার ধূসর জীবন হ'তে এসো,
তোমার রাত্রির এই ক্লান্ত স্তব্ধতা পার হ'য়ে এসো,
যেখানে প্রভাতের রক্তিম আশা কাঁপছে,
যেখানে আসে রাত্রের পাহাড়ে ঘননীল আভাস,
নামে সমুদ্রের গভীর অন্ধকার,
আর তারারা জ্বালে তীক্ষ্ণ, নীল আগুনের শিখা
আকাশের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।

তুমি কোনো উত্তর দিলে না, শুধু হাসলে,
সে ক্লান্ত, স্তিমিত হাসিতে
রাত্রির অবিশ্রাম, অশান্ত বিষণ্ণতা ।

সাড়া

সমর সেন

অর্দ্ধরাত্রে
দূর কোন্ অরণ্যে এলো করুণ মর্ম্মর,
আর উতলা হাওয়া দিলো অন্তরের শূন্যতায়,
আর রক্তের গভীর অন্ধকারে
চঞ্চলতা এলো হরিণ-শিশুর ।

দিগন্তের কুয়াসায় যেন স্বপ্নের আভাস
কোথায় কোন্ পথের ছুধারে নেমেছে গভীর অন্ধকার,
হাওয়ায় দেবদারুর স্তব্ধ-ঘন সারি
উঠছে কেঁপে,
আর ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর একপ্রান্তে—
সহসা এসেছে অরণ্যের হাহাকার
পাষাণের দীর্ঘ রেখায়।

স্বপ্ন-সিদ্ধি

স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

ছিলেম এক টুক্‌রো পাথর ।
তুমি হাতুড়ি বাটালি নিয়ে বস্‌লে মূর্ত্তি রচনায় ।
কি যেন একটা স্বরূপ ফুট্‌ল পাথরে ।
তোমার চিত্রানুবন্ধে পড়্‌ল বাধা,
পাত্তাড়ি গুটিয়ে চলে গেলে তুমি ।
আমি রইলাম পড়ে, অসমাপ্ত আভাসমাত্র ।

পথের লোকে দেখে আমাকে প্রশ্নভরা চোখে ।
কেউ বলে দেবতার মূর্ত্তি,
কেউ বলে দানবের ।
কেউ দিতে চায় সিঁদুরের ফোঁটা,
কেউ মাখাতে চায় কালি ।

আমার কৌতূহল হয় জানতে আমাকে,
যে আমি তোমার হাতের অপূর্ণ মূর্ত্তি ।
সেদিন অঝোরে নাম্‌ল বাদল,
চারিদিক থৈ থৈ কর্‌ছে জলে ,
সেই জলে দেখ্‌তে পেলেম আমার আবছায়া ।

এই পাথরের বুকে এখন স্বপ্ন জাগে ।
স্বপ্নে দেখি তোমার ছেনী হাতুড়ির নর্ম্ম লীলা ।
সংঘাতে সংঘাতে নির্খচিত হচ্ছে রূপ রেখা,
বেদনায় বেদানয় উঠ্‌ছি ফুটে তোমার বাসনায়,
শিল্পীর পরিকল্পনা পাষাণের বক্ষে পায় স্বপ্ন-সিদ্ধি ।

পুরুৎঠাকুর

স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

পতি পত্নী উভয়েই লেখেন কবিতা,
কেউ কাউকে দেখান না।
যেন সংগোপনে চল্‌ছে গ্রাবু খেলা,
অদৃশ্য 'পার্টনার', পিঠগুলো জমা হচ্ছে খাতায়।

একসঙ্গে সংসারযাত্রা কর্‌তে হ'লে
ঢাক্‌ঢাক্ গুড়্‌গুড়্ আর চলে ক'দিন ?
খাতাগুলো পড়লো পরস্পরের কাছে ধরা,
গোপনে গোপনে চল্‌ল গোয়েন্দাগিরি।

পত্নী দেখেন সপত্নীর ছবি স্বামীর কবিতায়
যে মূর্ত্তিটি গৃহিণীর চিত্রপটে ফোটে,
তার সঙ্গে স্বামীর আদপে নাই আদল।
দুপক্ষেই যুগপৎ প্রশ্ন জাগে—কার উদ্দেশে ওর কবিতা

কিন্তু কবিতার নায়ক নায়িকারা থাকে তুরীয় লোকে,
নাগালের সম্পূর্ণ বাহিরে,
সনাক্ত করা চলে না।
সুতরাং অসূয়ার শর পায় না কোনো শরবৎ।

আমি ছিলাম ওদের অন্তরঙ্গ বন্ধু।
উভয়েরই নালিশ রুজু হ'ত জনান্তিকে আমার কাছে।
দেখ্‌লুম ওরা সুখে থাকৃতে খাচ্ছে ভূতের কিল,
ভূতটা উভয়পক্ষীয় ও অন্তর্গুহাবাসী।

সব চেয়ে ভাবরসাত্মক দুটি কবিতার নকল
সংগ্রহ কর্‌লাম দুজনেরই কাছ থেকে।
এ কর্‌ল ওর তহবিল তছ্‌রূপ।
শালিশির ভার রইল আমার হাতে।

দুখানা স্বতন্ত্র খামের উপর ওদের নাম ধাম লিখোলেম।
স্বামীর নামে চিঠিখানার খামে মেয়েলি লেখা,
আর স্ত্রীর পত্রের লেফাফায় পুরুষের হস্তাক্ষর।
চিঠি দুখানা স্বহস্তে ফেলে দিলেম ডাকে।

'মডার্ন্‌' দম্পতী, কেহ কারুর চিঠি খোলেন না।
যে যার ঘরে ব'সে পত্রোদরস্থ কবিতা পাঠ কর্‌লেন,
চোরাই মালের এক-একটা নমুনা
পেলেন ওঁরা নিজ নিজ পত্রে।

এখন ওরা দুজনেই কবিতা লিখ্‌ছে,
এবং পরস্পরকে প'ড়েও শোনাচ্ছে।
আমাকে ডাকে পুরুৎঠাকুর ব'লে,
আমি নাকি বেঁধেছি ওদের মগ্ন-চৈতন্যের গাঁঠ্‌ছড়া।

বনলতা সেন

জীবনানন্দ দাশ

হাজার বছর ধরে' আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে ,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে : বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন ।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য্য ; অতি দূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকীর রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখী ঘরে আসে—সব নদী,—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

কুড়ি বছর পর

জীবনানন্দ দাশ

আবার বছর কুড়ি পরে একদিন তার সাথে দেখা হয় যদি !
আবার বছর কুড়ি পরে !—
হয়ত ধানের ছড়ার পাশে
কার্ত্তিকের মাসে ;—
তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে ,—তখন হলুদ নদী
নরম নরম হয় শর কাশ হোগ্‌লায়—মাঠের ভিতরে !

অথবা নাইক' ধান ক্ষেতে আর,—রয়েছে ফাটল ;
ব্যস্ততা নাইক' আর ;
হাঁসের নীড়ের থেকে খড়
পাখীর নীড়ের থেকে খড়
ছড়াতেছে ; মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল !

জীবন গিয়েছে চ'লে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার,—
তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার !

হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে,
সরু সরু কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার
শিরীষের অথবা জামের,
ঝাউয়ের—আমের ;
কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে !

জীবন গিয়েছে চ'লে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার,—
তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার !

তখন হয়তো মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে,—
বাব্‌লার ডালের অন্ধকারে
অশথের জানালার ফাঁকে
কোথায় লুকায় আপনাকে !
চোখের পাতার মত নেমে চুপি কোথায় চিলের ডানা থামে !—

সোনালি সোনালি চিল,—শিশির শিকার করে' নিয়ে গেছে তারে !—
কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায় পাই যদি হঠাৎ তোমারে !

মৃত মাংস

জীবনানন্দ দাশ

ডানা ভেঙে ঘুরে ঘুরে পড়ে' গেল ঘাসের উপরে ;
কে তার ভেঙেছে ডানা জানেনা সে ;— আকাশের ঘরে

কোনোদিন—কোনোদিন আর তার হবে না প্রবেশ ?
জানে না সে ;—কোনো এক অন্ধকার হিম নিরুদ্দেশ

ঘনায়ে এসেছে তার ? জানে না সে, আহা,
সে যে আর পাখী নয়—রং নয়—খেলা নয়—তাহা

জানে না সে ; —ঈর্ষা নয়—হিংসা নয়—বেদনা নিয়েছে তারে কেড়ে !
সাধ নয়—স্বপ্ন নয়—একবার দুই ডানা ঝেড়ে

বেদনারে মুছে ফেলে দিতে চায় ;—রূপালি বৃষ্টির গান, রৌদ্রের আস্বাদ
মুছে যায় শুধু তার,—মুছে যায় বেদনারে মুছিবার সাধ।

ঘাস

জীবনানন্দ দাশ

কচি লেবুপাতার মত নরম সবুজ আলোয় পৃথিবী ভ'রে
গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;
কাঁচা বাতাবীর মত সবুজ ঘাস, —তেম্নি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে !
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মত
গেলাসে গেলাসে পান করি ,
এই ঘাসের শরীর ছানি,—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,.
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

শেক্‌স্‌পীয়রের সনেট অবলম্বনে

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

XXVII

(WEARY WITH TOIL, I HASTE ME TO MY BED)

শান্তিসমুৎসুক হয়ে ত্বরা লই আশ্রয় শয়নে,
শ্রান্তি-অবসন্ন দেহ পথকষ্ট পাশরিতে চায় ;
তখন আমার চিত্ত বাহিরায় আবার ভ্রমণে,
শরীরের কর্ম্মচ্যুতি মানসেরে কর্ত্তব্য জোগায় ;
তখন আমার চিন্তা এ-অখ্যাত রাত্রিবাস ছাড়ি
দুর্গম তীর্থের পথে যাত্রা করে তোমার সন্ধানে ;
অবনত আঁখিপাতা কোনোমতে মুদিতে না-পারি,
অন্ধভোগ্য অন্ধকারে চেয়ে থাকি নিঃস্পন্দ নয়ানে ;
কিন্তু সে-বিকীর্ণ অমা একেবারে নিরালোক নয়,
জলে মণিদীপসম তার কেন্দ্রে ছায়ামূর্ত্তি তব ;
হানে সে-ভাস্বর রুচি নিশীথের নিবিড় সংশয়,
রূপ দেয় তমিস্রারে, জরতীরে করে অভিনব ।
এই ভাবে দিনে দেহ, এই ভাবে রাতে মোর মন
পায় না বিরাম খুঁজে, তোমাকেই করে অন্বেষণ ॥

XXIX

(WHEN IN DISGRACE WITH FORTUNE AND MEN'S EYES.

ভাগ্যের ভ্রূভঙ্গে আর মানুষের তিরস্কারে জ'লে
অপাংক্তেয় আত্মা যবে নির্ব্বাসনে করে পরিতাপ,
বিধির বধির কানে পণ্ডশ্রমে কাঁদে উচ্চরোলে,
আপন দরদী হয়ে অদৃষ্টেরে দেয় অভিশাপ,
যখন প্রলুব্ধ হই অপরের আশাধিক্য দেখে,
হিংসা করি তার রূপ, মাগি তার বান্ধবমণ্ডলী,
যা কিছু আজন্ম প্রিয়, সে-সবেরে দূরে ঠেলে রেখে
পরের সুযোগ সাধি, হতে চাই পরবলে বলী ;
সে-আত্মধিক্কৃত ক্ষণে কিন্তু যদি দুঃস্থ চিন্তা মম
পায়, বন্ধু, দৈবক্রমে লক্ষ্যরূপে বারেক তোমায়,
তবে চিত্ত আচম্বিতে, নিশান্তের ভরদ্বাজসম,
মৃন্ময় কুলায় ছাড়ি স্বর্গদ্বারে মাঙ্গলিক গায়।
তোমার প্রেমের স্মৃতি করে মোরে যে-ঐশ্বর্য্য দান,
তার পাশে অবজ্ঞেয় চক্রবর্ত্তী রাজার সম্মান।

প্রথম পার্টি

বিষ্ণু দে

শুধালাম, রবে এই ঘরে ?
এই ভিড়ে ? সুরেশের সুবর্ণের অশ্লীল নিশ্বাসে
ভারাক্রান্ত হাওয়া হেথা। কঠিন দেয়াল
কাঁপে দেখ সুষমার অসুস্থ উচ্ছ্বাসে।
তোমার শরীর শ্যাম তরুণ তমাল
এখানে শুকায়ে যাবে সুবর্ণের সুরেশের কদর্য্য নিশ্বাসে।

বাগানে কি যাবে ?
কি হবে এ ঘরে ?—
শুধালাম শমিতার কলকণ্ঠে চাপা মৃদুস্বরে।
নাগরী সে নারী—
চোখে তার এলো কেন হরিণীর ভয় ?
কুমারীর চোখে কেন এলো ভয় আদিমকালের
মোর পাশে কেন এ সংশয় ?
কেন সে ভাবিলো মোরে অসভ্য বর্ব্বর
রূঢ় দুঃশাসন ?
কেন এ নির্জ্জন
বাগানের শীতল হাওয়ায় আকাশের নক্ষত্রসভায়
মোর সাথে সুবসনা তার কেন যেতে হলো ভয় ?

তবু তাকে লেগেছে তো ভালো।
যদিচ চোখেতে তার জ্বলেনি কো মনীষার আলো
যদিচ শরীর তার গড়েনি কো লোলুপ ভাস্কর
তবু ভালো, তবু তাকে লেগেছে তো ভালো।

আমাকে বন্ধুর মোর লাগেনি কো ভালো।
পৌঁছিয়ে দিলো না মোরে উৎসবের শেষে।
লজ্জিত, দুঃখিত আমি। দুর্ভাগ্য আমার।
হবিবুর খাঁর
শরদনিস্রাব সুধা তবু মোরে করেছে শীতল।
তবু মোর লাগিয়াছে ভালো
বন্ধুকে আমার।
লাগিয়াছে ভালো
নভোনীল-বেশিনীর শরীরের মোলায়েম উদাস সুবাস।

জীর্ণ গৃহ দরিদ্রের, নেই অলঙ্কার
নেই সজ্জা, প্রাচুর্য্যের ভার
ম্যাকেঞ্জি লায়ালে মোর নেই কারবার।
বন্ধুর আমার
কিবা অপরাধ ?
উদ্ধত ব্যঙ্গের রঙে মুখ মোর করিনি রঙিন
স্বার্থপর মূর্খতায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে মোর দিন
করিনি নিঃশেষ আজো ব্যাঙ্কের খাতার তলায়।
খেলার মাঠে বা রেসে, সিনেমার বারে
দেখাশোনা হয় না কো প্রায় বারে বারে
মানুষের শানে আজো করিনি কো নিজেরে ধারালো।
তবু সখা, সুঠাম সুবেশ তুমি, তোমাকে লেগেছে
মোর সত্যিই ভালো।

কলাশালী আত্মম্ভরী স্থূল অধ্যাপক
আত্মবিজ্ঞ উদ্ধত শিক্ষক
কুটিল কুৎসিত নারী, লোলবুদ্ধি বন্ধুরা আমার
দ্বিপ্রহর যাহাদের গৃহে কাটে ; ঘৃতচিক্কণ স্ফীত যাহাদের ঘাড়
ভিখারী বঞ্চক আর সাহিত্যের ধূর্ত্ত পেশাদার
সবি আজ লাগিয়াছে ভালো।
সমস্ত পৃথিবী আজ আকাশবাতাস
আমার সমগ্র মন, প্রতি স্নায়ুশিরা
জ্বালে অন্তহীন দূর আকাশের নীলে
কোলাহলহীন কোন্ অলৌকিক দেয়ালির আলো।

মোর শুধু এই মনে হয়, এ মোর আনন্দরাশি
ভালো লাগা এই
এ কি মোর কাপুরুষতার প্রাণহীন গূঢ় ছদ্মবেশ ?
অস্ত্রহীন অহিংসার বৃহন্নলারূপ ?
সত্যই কি পৃথিবীর আনন্দমন্থন
বাইশটি বসন্তের সঞ্চিত সঙ্গীত
আমার স্নায়ুতে এসে কাঁপে থরথর
দুয়ারে প্রতীক্ষারত উদ্যত ট্যাক্সির মতো ?

বাড়ী-বদল

অজিতকুমার দত্ত

রোজ দুবেলা সে আমার চোখে পড়েছে,—
তবু আমি তাকে দেখিনি।
তার চোখের দীর্ঘপল্লবের ছায়ায়, তার কেশ-অরণ্যে
আমার চোখ বিশ্রাম নেয়নি।
সেখানে হয়তো আবেশ ছিলো—
কিন্তু আমার চোখ চলে' গেছে দূরে
যেখানে আরক্ত কিশলয় পল্লবের গৌরবে শ্যাম হয়ে উঠেছে—
যেখানে বিশ্রামের তৃণশয্যা আস্তীর্ণ।

আজ দেখি ওরা বাড়ী-বদল করছে।
মস্ত লরী এলো—
ভারী কাঠের টেবিল চেয়ার তোরঙ্গ আর খুঁটিনাটিতে
ভরে উঠল ওদের যাত্রার আয়োজন—
তারপর শোনা গেল হাল্কা পায়ের শব্দ
যেন বিয়ের জগঝম্পের পর
বাসিবিয়ের সানাই।
গাড়ীতে উঠবার আগে সে একবার ফিরে তাকালো—
এ রকম হয়তো সে আরো অনেক প্রভাতে
অনেক সন্ধ্যায় তাকিয়েছে।
কিন্তু আজ আমার মনে হ'ল—
সন্ধ্যার তারাটি যেন অকস্মাৎ খসে পড়েছে
ওই অরণ্যের তৃণের উপর
আমার শ্যামল বিছানায়।

আধুনিকতার মোহ

যত দিন যাচ্ছে, ততই স্পষ্ট করে' উপলব্ধি করছি যে কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছু সেকেলে। কেননা এখনো আমি কাব্য-বিচার করি নিতান্তই আমার ভালো-লাগা মন্দ-লাগা দিয়ে, এবং ঈশ্বর যদি সহায় হন, বাকি জীবন তা-ই করবো। কিন্তু আভাসে-ইঙ্গিতে এটা যেন টের পাচ্ছি যে বিলেতে সম্প্রতি একদল দেখা দিয়েছেন যাঁরা কবিতা সম্বন্ধে এই চিরন্তন মানটি প্রয়োগ করতে একেবারেই নারাজ। এমনো মনে হ'তে পারে যে ভালো-লাগা মন্দ-লাগার (বিশেষ করে' ভালো-লাগার) ক্ষমতাই তাঁরা উপড়ে ফেলেছেন তাঁদের মানসশরীর থেকে। ওটার আর দরকার হয় না আজকাল। যেমন কিনা নতুন ও নিপুণতরো কোনো যন্ত্র উদ্ভাবিত হ'লে পুরোনো কাজ-চালানো গোছের যন্ত্র হয় বর্জ্জনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইডিথ সিট্‌ওয়েল নামের এক মহিলার উল্লেখ করতে পারি। এই মহিলার কাব্য-সমালোচনা পড়লে এই ধারণাই জন্মায় যে কবিরা কবিতা লেখেন শুধু স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ, যতি ও মাত্রা, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির লীলা-খেলা দেখবার জন্য—এবং, বলাই বাহুল্য, শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল কর্ত্তৃক সেই লীলা-খেলার রহস্যোদ্‌ঘাটনের আশায়। কবিতা হচ্ছে স্বর-ব্যঞ্জনের ভেল্কিবাজি, যার দেখানে-ওয়ালা হচ্ছেন শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল।

বিলেতে এ-রকম হচ্ছে, সুতরাং আমাদের দেশেও হচ্ছে। আমাদের দেশে যাঁরা আধুনিক, যাঁরা এগিয়ে-চলার দলে, তাঁরাও এখন কবিতা সম্বন্ধে ভালো-লাগার কথাটাকে বিশেষ আমল দেন না। তাঁদের কথা-বার্ত্তা, সত্যি বলতে, আমি ভালো বুঝিনে। কবিতার কাছ থেকে কী তাঁদের প্রত্যাশা সেটা বেশি স্পষ্ট নয়। তবে একটা ধরা বুলি তাঁদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়: সেটা হচ্ছে মডার্ন।

এখন এই মডার্ন কথাটিকে এককালে আমি যতই ভালোবাসতুম, এখন তাই ভয় ক'রে' চলি। বিশেষ ভয় করি আমাদের দেশের আধুনিকতা, যার শরীর আগাগোড়া বিলিতি বইয়ের পাতা দিয়ে তৈরি। বলা বাহুল্য, কাগজের শরীরে রক্ত থাকে না। তাকে রঙচঙ মাখিয়ে জাহির ক'রে' বড় জোর কয়দিনের জন্য লোকের চোখ ঝলসানো যায়।

যদি আমরা কোনো নতুন কবিতা পড়ে' এইটেই বিচার করতে বসি যে সেটি 'মডার্ন' হয়েছে কিনা, তাহ'লে আমরা কবিতা না-পড়লেও পারি। যদি আমরা কবিতা লিখতে গিয়ে 'আধুনিক' হবার চেষ্টাতেই নিজেকে নিঃশেষ করি তাহ'লে আমরা কবিতা না-লিখলেও পারি। এই যে আমরা আধুনিক বলি, কথাটার মানে কী? একটা মানে অবশ্য সাময়িক, ঐতিহাসিক; আধুনিক কিনা হালের রচনা, যেটার আবির্ভাব হয়েছে সম্প্রতি। তা ছাড়া অন্য-কোনো অর্থ করতে গেলে টেঁকসই হয় না। 'আধুনিক কবিতা' ব'লে এমন কি কিছু আছে, যা একেবারে শরীরে-আত্মায় সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতা থেকে আলাদা? এবং এ-ও কি বলা যায় যে কোনো হালের কবিতা কোনো গোষ্টিবদ্ধ আধুনিকতার বিশেষ দাবি মেটাতে না-পারলেই বর্জ্জনীয় হবে? আর এ-কথাও কি বুঝিয়ে বলতে হবে যে আধুনিকতা জিনিসটাই সাময়িক ও আপেক্ষিক: আজকের দুর্জ্জয় একেলিয়ানা মামুলি সাবেকিয়ানায়

পরিণত হ'তে বেশিদিন লাগে না, ভালো চিরদিনই ভালো। গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা তার নির্লজ্জ সাবেকিয়ানা নিয়েও ভালো, নিঃসংশয়েই ভালো; আর কালিদাস রায়ের কবিতা যে খারাপ তা সেকেলে ব'লে' নয়, খারাপ ব'লে'ই। অন্যপক্ষে, আধুনিকতায় বিশুদ্ধ ও নির্দ্দোষ হ'য়েও কবিতা যে খারাপ হ'তে পারে, তার প্রমাণ কোনো-কোনো যুবক-কবি যথেষ্টই দিয়েছেন।

আমাদের দেশের বিশেষ-এক সুধীশ্রেণীকে সম্প্রতি এই আধুনিকতার মোহে পেয়ে বসেছে। এ নিয়ে দুঃখ করতুম না, যদি না-জানতুম তাঁদের কারো-কারো মধ্যে কবিত্বশক্তির স্ফুলিঙ্গ আছে। দুর্ব্বলের মুখ-ভ্যাঙচানো হাস্যকর, কিন্তু শক্তির বিকৃতি শোচনীয়। কোনো চলতি ঢঙে কি লোভনীয় কতগুলো মতবাদে অতিরিক্ত আসক্তি কাব্যের স্বাভাবিক প্রেরণাকে বিকৃত ক'রে' তুলতে বাধ্য। তার উদাহরণ বর্ত্তমানে বিরল নয় আমাদের দেশে। কোনো মতের মোহে প'ড়ে' সেই মতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে রচনা করার মত দুর্গতি কবির পক্ষে আর-কিছুই হ'তে পারে না।

এই কথাটাই আমি বলতে চাই যে কবিতা এক, যুগে-যুগে তার রূপের অদলবদল হয় মাত্র। আজকালকার কবিতার যেটুকু নতুনত্ব তা শুধু আঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক দিকের; কবিতার প্রাণ-বস্তু একই। মধুসূদনের সময়ে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রচণ্ড নতুন জিনিস, রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে 'কড়ি ও কোমল' আশ্চর্য্য অভিনব। নিছক নতুনত্বের রঙ অবিলম্বেই ধুয়ে যায়, যেটা থাকে সেটাই আসল জিনিস, সেটাই কবিতা। কবিতার পক্ষে, তাই, আধুনিক হওয়াটাই বড় কথা নয়, ভালো হওয়াটাই আসল কথা। এ-কথা প্রতি যুগে সমান সত্য। আজকাল শুনতে পাই ইংরেজি কবিতায় বিষয়-বস্তুর বিস্তার হয়েছে।

সন্দেহ করি। তলা পর্য্যন্ত খুঁড়লে দেখা যাবে কবিতার সেই মামুলি, সাধারণ, চিরন্তন, ধ্বংসহীন বিষয়গুলোই রয়ে' গেছে: যেমন প্রেম প্রকৃতি মৃত্যু ঈশ্বর। বিষয়গুলো অপরিবর্ত্তনীয়; অপরিবর্ত্তনীয় এদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ; যা বদলায়—এবং বদলাতে বাধ্য—তা হচ্ছে এই সম্বন্ধগুলো গ্রহণের ও মননের ভঙ্গি। যেমন ওয়ার্ডস্বার্থের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা ও ডেভিসের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতায় প্রভেদ আছে; প্রভেদ আছে শেলির ও লরেন্সের প্রেমের কবিতায়। আর একটা মোহ খুব সহজেই মনকে দখল করে, সেটাও বলি। মানুষের জ্ঞানের বিস্তার হয় বলে'ই কবিতার বিষয়ের বিস্তার হয় না। এলিয়ট যদি সমসাময়িক সমস্ত জ্ঞান শোষণ ও হজম করে' নিয়ে সেটা তাঁর কাব্যের অঙ্গীভূত করে' থাকতে পারেন, ঠিক তাই করেছিলেন চসার, তা-ই করেছিলেন ডান; এলিয়টের অধিগম্য জ্ঞান বেশি বলেই তাঁকে বাড়তি বাহবা দেয়া যায় না। কবিতার ক্ষেত্রে জ্ঞানের কোনো নিজস্ব মহিমা নেই; জ্ঞানের রাসায়নিক সার উজ্জীবিত হ'য়ে কবিতা হ'য়ে উঠলে তবে সেটা গ্রাহ্য হয়। শেষ ফল হয় কবিতাই, কবিতাই হচ্ছে আসল।

আসল হচ্ছে কবিতাই, ভালো কবিতা। তা ছাড়া আর-কিছু নেই এবং ভালো কবিতার অবিশ্যি অসংখ্য রূপ ও রকম আছে। ভালো কবিতা পয়ারে হ'তে পারে, হ'তে পারে জটিল সংস্কৃত পদ্যে, হ'তে পারে সরল গদ্যে। কোনো বিশেষ একটি বাহ্যরূপের প্রতি সেন্টিমেন্টাল মমত্ববোধ আমাদের ভুল রাস্তায় নিয়ে যায়। যাঁরা কেবল 'formal' কারণে কবিতা পড়েন ও 'formal' বিচারে কবিতা বোঝেন, আমার মতে তাঁরা করুণার পাত্র; কেননা বিপুল রসের ভোজে নিমন্ত্রিত হ'য়ে তাঁরা রান্নাঘরের অলি-গলির খোঁজ নিয়েই ফিরে যান। তাঁরা কত যে ঠকেন তা নিশ্চয়ই তাঁরা জানেনও না, যেহেতু জানলে আর তাঁরা ঠকতে রাজি

হ'তেন না। কবিতার সঙ্গে আমাদের যোগ তো 'formal' নয়—কোনো অর্থেই নয়। তা নিবিড় প্রাণের ও রক্তের যোগ। কবিতা আমাদের রক্তে জোয়ার আনে বলে'ই তাকে আমরা এত ভালোবাসি। কথাটা কিছু সেকেলে হ'লো বুঝি: সুধীজন দয়া করে' আধুনিক সাইকলজির পরিভাষায় মনে-মনে তর্জ্জমা করে' নেবেন।

এই আধুনিকতার মোহ-লাগা চোখ নিয়ে আজকালকার বাঙলা কবিতায় কেউ-কেউ বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। বিশেষ-কিছু মানে এখানে নতুন-কিছু। এবং একটা বিশেষ, সঙ্কীর্ণ, এমনকি গোষ্ঠিগত অর্থে নতুন। অর্থাৎ, গেলো মেলে ফেবার কোম্পানির যে-সব টাটকা বই এসেছে তাতে প্রচারিত কাব্যাদর্শের সঙ্গে মিলছে না বলে'ই মনটা খুঁতখুঁত করছে। যে-ভালো লাগাটা মুক্ত ও সহজ, এবং শেষ পর্য্যন্ত যেটা কবিতা পড়ার চরম পুরস্কার, বাইরের এই চাপে সেটা আবিল ও আড়ষ্ট হ'য়ে উঠছে। কী হচ্ছে আজকাল বাঙলা কবিতায়? এর উত্তরে অনায়াসে বলা যায়: রবীন্দ্রনাথ এখনো লিখছেন, বাঙলায় গদ্য-ছন্দ এসেছে, দেশে অন্তত ছ'জন মানুষ আছেন, যাঁরা কবিতা লিখে যাচ্ছেন, এবং ভালো কবিতা লিখছেন। কিন্তু পুনশ্চর গদ্য তো ঠিক ইংরিজি গদ্য-ছন্দের অনুরূপ নয়, আর-যাঁরা গদ্যে লেখেন তাঁদেরটাও প্রায় ঠিক হয় না; এবং যাঁরাই কবিতা লিখছেন তাঁদের রচনার নতুনত্বটা কোথায়? নতুনত্ব না-ই বা থাকলো, ভালো লাগলো তো? পুনশ্চ না-হয় ঠিক ইংরিজি গদ্য-ছন্দের মত না-ই হয়েছে, কবিতাগুলো ভালো লাগলো তো?

এ-ধরণের আপত্তি যাঁরা করেন, তাঁদের কাছে নিছক ভালো-লাগাটার কোনো দামই নেই, এবং সেটাই ঘোরতর আক্ষেপের কথা। কেননা, শেষ পর্য্যন্ত, ঐ ভালো-লাগাটাই তো সব, ঐ ভালো-লাগা হচ্ছে সমস্ত আলোচনার প্রথম ও শেষ কথা। আমার ভালো লাগে, তাই আমি ভালো

বলি। সকলের সব ভালো লাগে না, তাই সকলে সব ভালো বলে না। আঙ্গিক আলোচনার কোনো মূল্য যে নেই তা নয়, কিন্তু তার ক্ষেত্রই আলাদা। কবিতার মর্ম্মে পৌঁছবার পথ নয় সেটা।

এখন এই যে আমি বলছি ভালো লাগা, সেটা কী ? বলা শক্ত। তবে এটুকু বলা যায় যে কোনো কবিতা পড়ে' হঠাৎ চোখের সামনে একটা ছবি ফুটে ওঠে, বুকের মধ্যে যেন বেজে ওঠে স্মৃতির মর্ম্মর। কোনো কবিতা শরীরের স্পর্শের মত লাগে, কোনো কবিতা হঠাৎ-মনে-পড়া পুরোনো গন্ধের মত। কোনো কবিতা পড়তে-পড়তে নিঃশ্বাস ভারি হয়, হৃৎস্পন্দন ওঠে দ্রুত হ'য়ে, পথে চলতে-চলতে হঠাৎ কোনো টুকরো লাইন মনে পড়ে' আচমকা থমকে যেতে হয়। কোনো কবিতা একবার পড়বার পর আমাদের সমস্ত দিন-রাত্রিকে হানা দেয়, তারপর কোনো অলস মুহূর্ত্তের বিদ্যুৎ-ঝলকে তার গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করে' সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। এ-পর্য্যন্ত আমি বলতে পারি, এর বেশি পারিনে। কবিতার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই এইরকম, যদিও এই অনুভূতিগুলোর মাত্রার তারতম্য নিশ্চয়ই থাকবে। যখন কোনো কবিতাকে ভালো বলি, যখন কোনো কবিতাকে আশ্চর্য্য অপরূপ বলি, যখন বলি এই হচ্ছে মহৎ কবিতা—তখন এই অনুভূতিগুলো ও তাদের প্রাবল্যের তারতম্যই আমাদের একমাত্র সহায়। অন্য সব পাণ্ডিত্যের তুবড়ি।

চিঠি-পত্র

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু—

তোমাদের "কবিতা" পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেক রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য-বারোয়ারির দল-বাঁধা লেখার মতো হয়নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে এরা নূতন পরিচয় স্থাপন করেছে। অল্পদিন আগে পর্য্যন্ত দেখেছি বাংলায় গদ্যছন্দের কবিতা আপন স্বাভাবিক চালটি আয়ত্ত করতে পারেনি। কতকটা ছিল যেন বহুকাল খাঁচায় বন্দী পাখীর ওড়ার আড়ষ্ট চেষ্টা। গদ্যছন্দের রাজত্বে আপাতদৃষ্টিতে যে স্বাধীনতা আছে যথার্থভাবে তার মর্য্যাদা রক্ষা কঠিন। বস্তুত সকলক্ষেত্রেই স্বাধীনতার দায়িত্ব পালন দুরূহ। বাণীর নিপুণ-নিয়ন্ত্রিত ঝঙ্কারে যে মোহসৃষ্টি করে তার সহায়তা অস্বীকার করেও পাঠকের মনে কাব্যরস সঞ্চার করতে বিশেষ কলাবৈভবের প্রয়োজন লাগে। বস্তুত গদ্যে পদ্যছন্দের কারুশিল্পকৌশলের বেড়া নেই দেখে কলমকে অনায়াসে দৌড় করাবার সাহস অবারিত হবার আশঙ্কা আছে। কাব্যভারতীর অধিকারে সেই স্পর্দ্ধা কখনোই পুরস্কৃত হতে পারে না। অনায়াসের আগাছায় ভরা জঙ্গলকে কাব্যকুঞ্জ বলে চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব। তোমরা ফাঁড়া এড়িয়ে

গেছ। কেবল দেখলুম স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়ের কবিতাটি পদ্যছন্দের মৌতাত একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পূর্ব্ব অভ্যাসের বাঁধন তার পায়ে জড়িয়ে আছে, গদ্যের জুতোজোড়ার উপরে ছিন্নপ্রায় ঘুন্টি-বিরল পদ্যনূপুরের উদ্বৃত্ত। অথচ অন্যত্র এই ছদ্মনামা কবির লেখায় অবাধছন্দের কলাদক্ষতায় আমি বিস্মিত হয়েছি। তা বলে তাঁর এ কবিতাটি বর্জ্জনীয় নয়—আমি যা বলেছি সে আঙ্গিকের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে লেখাটির উপভোগ্যতা অস্বীকার করতে পারিনে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের "তামাসা" কবিতাটিতে পাহাড়তলীর বন্ধুর ভূমির মতো গদ্যের রুক্ষ পৌরুষ লাগলো ভালো। তোমার কবিতা তিনটি গদ্যের কণ্ঠে তালমান-ছেঁড়া লিরিক, এবং ভালো লিরিক। সঙ্গে সঙ্গে পদ্যছন্দের মৃদঙ্গওয়ালা বোল দিচ্ছে না বলে ভাবের ইঙ্গিতগুলি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সহজে, অথচ সহজে নয়। বিষ্ণু দের কবিত্বশক্তি আছে কিন্তু তাকে মুদ্রাদোষে পেয়েছে, সেটা দুর্ব্বলতা। বিদেশী পৌরাণিক বা ভৌগলিক উপমা কোনো বিশেষ কবিতার অনিবার্য্য প্রাসঙ্গিকতায় আসতেও পারে কিন্তু এগুলি প্রায়ই যদি তার রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচম্‌কা হুঁচট লাগাতে থাকে তবে বলতেই হবে এটা জবরদস্তি। ঘাট বাঁধানো দীঘির পাশাপাশি পাইনবনের ছবি আমাদের চোখে স্পষ্ট হতে পারে না। সাইকলজির আকাঁড়া ইংরেজী শব্দ বাংলাকাব্যের জঠরে চালান করতে পারো কিন্তু সেটা হজম না হয়ে আস্ত থেকেই যাবে। সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা টাঁ্যাকসই হবে বলেই বোধ হচ্চে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের "নীলিমাকে" কবিতাটি পূর্ব্বেই দেখেছিলেম এবং প্রশংসাও করেছি। সুধীন্দ্র দত্তের কবিতার সঙ্গে প্রথম থেকেই আমার পরিচয় আছে এবং তার প্রতি আমার পক্ষপাত জন্মে গেছে। তার একটি কারণ—তাঁর কাব্য অনেকখানি রূপ নিয়েছে আমার কাব্য থেকে—নিয়েছে নিঃসঙ্কোচে—অথচ তার প্রকৃতি

সম্পূর্ণ তাঁর আপন। তাঁর স্বকীয়তা চেষ্টামাত্র করেনি অনন্যত্বের স্পর্দ্ধায় যথাস্থান থেকে প্রাপ্তিস্বীকার উপেক্ষা করতে। এ সাহস ক্ষমতারই সাহস। এবারে তাঁর জন্মান্তর কবিতাটি বিশেষ ভালো লাগল। সুধীন্দ্রের কাব্যকে গাল দিয়েও সমালোচকেরা সম্মানিত করেনি এই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে—এ ছাড়া অজিতকুমার দত্ত ও প্রণব রায়ের কবিতা পড়ে আমার মন তখনি স্বীকার করেছে তাঁদের কবিত্ব।

আমার কাছ থেকে কবিতা চেয়েচ। জাননা আমার কলমটাকে পিঁজরাপোলে পাঠাবার সময় এসেছে। অন্তর্য্যামী জানেন এখন না-লেখার চর্চ্চা করাই আমার চরম সাধনা। অনেকদিন লেখা চালিয়েছি এখন যদি পরের দাবীতে ও অভ্যাসের নেশায় লেখা না থামাতে পারি তাহলে অপঘাত ধ্রুব। এই যে তোমাকে দীর্ঘ চিঠিখানা লিখলুম এটা উজান ঠেলে। শরীর আমার নিরতিশয় ক্লান্ত, মন তাই কর্ম্মবিমুখ। তোমাদের তো সম্বল কম নেই দেখতে পাচ্চি—আমার কাছে প্রার্থনা করে লজ্জায় ফেলো না।
ইতি ৩ অক্টোবর ১৯৩৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* বুদ্ধদেব বসুকে লেখা

নতুন কবিতা

বীথিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বভারতী, আড়াই টাকা।

রবীন্দ্রনাথ যেন রূপকথার কবি, তাঁর চিরন্তন যৌবন। জলন্ত যৌবনের গান 'বলাকা' যে-বয়সের রচনা, বাঙালি ভদ্রলোকের পক্ষে সেটাই বার্দ্ধক্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কখনোই বৃদ্ধ বলে' ভাবেননি—সে-পর্য্যন্ত। সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও কখনো তাঁকে বৃদ্ধ বলে' ভাবতে শিখিনি। 'মনে হ'লো বৃদ্ধ আমি মন্দ লোকের কুৎসা এ।' আমাদেরও বরাবরই তা-ই মনে হয়েছে। যতদিন না রবীন্দ্রনাথই এ-কুৎসা রটনা করতে আরম্ভ করলেন নানাভাবে নানা ভঙ্গিতে। 'পূরবী'র সঙ্গে-সঙ্গেই রবীন্দ্র-কাব্য এ বিশেষ মোড়টি নিয়েছিলো। সেবার দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের সময়েই হঠাৎ তাঁর মনকে বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর চিন্তা হানা দিতে আরম্ভ করে। 'পূরবী'তেই এ-সুর সব চেয়ে স্পষ্ট, কিন্তু তার পর থেকে থেকে-থেকেই ফিরে-ফিরে আসছে; তাঁর পরবর্ত্তী কবিতার এটাই হ'য়ে উঠেছে প্রায় প্রধান বিষয়। বলতে-বলতে তিনি আমাদেরও প্রায় বিশ্বাস করিয়ে এনেছিলেন যে তিনি বুড়ো হয়েছেন। তবু বিশ্বাস হয় না কিছুতেই; তাঁর নিজের রচনাই বার-বার তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। এখনো তাঁর মধ্যে সেই মৃত্যুহীন কবি-কিশোরের লীলা। তাকে আমরা দেখেছি 'মহুয়া'তে, দেখেছি 'পুনশ্চ'তে, দেখেছি হঠাৎ-ঝলকে 'শেষ সপ্তকে'। 'বীথিকা'তেও তাকে দেখলাম।

মনে পড়ে যেন এককালে লিখিতাম
চিঠিতে তোমারে প্রেয়সী অথবা প্রিয়ে—

মনে পড়ে, মনে পড়ে। মনে পড়ে—এই হচ্ছে 'পূরবী' ও পরবর্ত্তী সমস্ত রবীন্দ্র-কাব্যের মূল কথা। এই বৃহৎ কাব্য-কাণ্ড স্মৃতির গোপন সুরঙ্গ

থেকে উৎসারিত; সমস্তটার উপর পড়েছে স্মরণের সোনালি হেমন্ত-আভা। যতদিন জীবন তীব্র দ্রুতস্রোতে বয়ে' চলে, পিছন ফিরে তাকাবার সময় পায় না মানুষ। কিন্তু একটা সময়ে বুঝি পিছন ফিরে তাকাতেই হয়; তারপর চোখ আর সেখান থেকে সরতে চায় না। 'বলাকা' পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য কেবলই এগিয়ে-চলার, কেবলই নব-নব দুঃসাহসে বিচিত্র অভিযানের। তারপর এলো বিকেল, পিছনের ছায়া দীর্ঘ হ'য়ে পড়লো। এ কোন্ চিরন্তন গ্রীষ্মের অপরূপ বিকেল, মেঘে-মেঘে রঙের খেলা চলেছে মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে; অলস হ'য়ে বসে'-বসে' দেখা, আর স্মৃতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত থেকে সোনালি ফসলের রাশি ঘরে তুলে আনা। জীবনটাকে এমনি করে' পাবার ও দেখবার সৌভাগ্য পৃথিবীতে খুব অল্প কবিরই হয়। এখন আর নেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, চিত্ততন্ত্রীতে অভিনব স্পন্দন; পুরোনো দিনের অশ্রু আর স্পর্শ আর রোমাঞ্চই এখন ফিরে আসছে, স্মৃতির জাদুতে রূপান্তরিত। এ নিয়ে তীব্র ও প্রচণ্ড কবিতা হয় না, কিন্তু প্রশান্ত-মধুর কবিতা হয়। এমনি মনে করতে পারা জীবনের অতুলনীয় একটি মধুরতা।

উপরে যা বললাম, বড় বেশি ব্যাপক মনে হ'তে পারে। 'পুনশ্চ' ও 'শেষ সপ্তকে'র সমস্তটা পড়ে' এ-কথা কিছুতেই বলা যায় না যে রবীন্দ্রনাথ এখন আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অধিকারী নন্। ('চার অধ্যায়'ও এই সঙ্গে ধরা উচিত—ও-বই তো আসলে একটি প্রেমের কবিতা।) তবু এটা নিঃসংশয়েই সত্য যে তাঁর সাম্প্রতিক কবিতার প্রধান যন্ত্রীই হচ্ছে স্মৃতি। অতীত থেকে হাওয়া বইছে, থেকে-থেকে বুকে এসে লাগছে পুরোনো প্রেমের ঝাপটা, অসহ ব্যথায়, অসহ মধুরতায়। সত্যি বলতে, ব্যক্তিগত প্রেম কখনোই এমন প্রাধান্য লাভ করেনি তাঁর কাব্যে। তাঁর রূপক-বিলাসী মন প্রেমের স্পষ্ট ও ব্যক্তিগত প্রকাশে বরাবরই কুণ্ঠিত ছিলো। তার ব্যতিক্রম ঘটেছে এই অতি-পরবর্ত্তী কাব্যেই। এখানেই পাওয়া যায় প্রেমের রূপক-মুক্ত সহজ উচ্চারণ। গেলো আট-দশ বছরের মধ্যে তিনি বাঙলা-ভাষার

কতগুলো শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা লিখেছেন। তবু তিনি এ-কথা বিশ্বাস করতে বলেন যে তিনি বুড়ো হয়েছেন!

'বীথিকা'র আঙ্গিক দিক থেকে দু'একটি কথা বলবার আছে। গদ্যে অনেকগুলো কবিতা লেখবার পর পদ্যে এই তাঁর প্রত্যাবর্ত্তন। এ-বইয়ে কতগুলো কবিতা আছে লঘুরসের, তাতে ছন্দের দোলা ও চমকপ্রদ মিলের বিস্ময়েরই প্রয়োজন। যে-কবিতাগুলো গভীর, সেগুলো গদ্যে লিখলেও ক্ষতি ছিলো না। এমনো যেন মনে হয় যে গদ্যে লিখলেই আমাদের জিৎ হ'তো বেশি। গদ্য-ছন্দ রবীন্দ্রনাথের নতুন দখল; তাই সে-ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা থাকে জাগ্রত ও উৎসুক, দীপ্তি ঠিকরেই পড়ে থেকে-থেকে। কিন্তু পদ্যের উপর তাঁর বহুদিনকার এমন সম্পূর্ণ প্রভুত্ব যে সে-প্রভুত্ব থেকেই এখন শৈথিল্য আসা অস্বাভাবিক নয়। পদ্য এখন তাঁর পক্ষে প্রায় অভ্যাসের মতই সহজ। রবীন্দ্রনাথেরই হাতে 'বলাকা'র ছন্দ আস্তে-আস্তে কী করে' নিস্তেজ হ'য়ে এলো এটা ভবিষ্যতের কোনো ডক্টরেট ডিগ্রিকামীর থীসিসের বিষয় হবে এমন আশা রাখি। সম্প্রতি ঐ ছন্দেরই একটা নতুন রূপ তিনি গড়তে চাচ্ছেন পংক্তিকে ছোট-ছোট অংশে কেটে-কেটে। যেখানে ছিলো অনেকক্ষণব্যাপী রুদ্ধশ্বাস দৌড়, সেখানে এখন ছোট-ছোট নিঃশ্বাসে বাক্যাংশের সূক্ষ্ম ভার-সাম্য, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্যালান্স্। যেখানে ছিলো বাণীর প্রচণ্ড বেগ, সেখানে এখন মাপা ওজনের সংহত উক্তি—একটি অংশ বজায় রাখছে বিপরীত অংশের ভার, ফলে সমস্তটা সমান হ'য়ে ঝুলে আছে। এ-ধরণের রচনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নতুন, এবং তাঁর এখনকার কাব্যের স্থৈর্য্য ও দার্শনিক অন্তর্মুখীতার সঙ্গে এটি মানিয়েছে ভালো। এদিকে এই ছন্দের আরো পরিণতির সুযোগ আছে, এমন ইঙ্গিত স্পষ্টই পাওয়া যায়। বাঙলাভাষায় দার্শনিক কি তার্কিক পদ্য লেখবার একটি উপযুক্ত রূপের অভাব আছে। আঠারো মাত্রার পয়ারকে অ্যাণ্টিথিসিসের কৌশলে দ্বিখণ্ড করে' বাঙলা হিরোয়িক কাপলেট নির্ম্মাণ করা যায় কিনা, সুধীসমাজে এ-প্রস্তাবটি আমি উত্থাপন করছি।

অর্কেষ্ট্রা—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।
ভারতীভবন, একটাকা বারো আনা।

কবিদের মধ্যে দুটো জাত আছে: যাঁরা ঝোঁকের মাথায় লেখেন, আর যাঁরা ভেবে-চিন্তে লেখেন; যাঁরা কবিতা লেখেন না-লিখে পারেন না বলে', আর যাঁরা লেখেন লিখতে হবে বলে'ই। কোনো-কোনো কবি আছেন স্বভাবতই মাতাল, কোনো-কোনো কবি নিতান্তই প্রকৃতিস্থ। তীব্র আবেগই হচ্ছে প্রথম জাতের কবিদের চিরন্তন উৎস, দ্বিতীয় জাতের কবিরা বুদ্ধিনির্ভর। কবিতার এই দুটি ভাবে কখনো মেলামেশা না হয় এমন নয়, তবু এই আলাদা দুই জাত স্পষ্টই চেনা যায়। শেলি বার্ন্‌স্ রবীন্দ্রনাথ প্রথম জাতের, মিল্‌টন রবার্ট ব্রিজেস মোহিতলাল দ্বিতীয় জাতের।

সুধীন্দ্রনাথকে প্রথম জাতের না-বলে' বরঞ্চ দ্বিতীয় জাতের বলাই ভালো। স্বতঃস্ফূর্ত্ত গীতি-কবি হিসেবে বিচার করলে তাঁর সমূহ ক্ষতি। গীতিকবিতার সহজ ফূর্ত্তি নেই তাঁর রচনায়। মুহূর্ত্ত-মধুর, পলাতক ভাবগুলি হাঁপিয়ে ওঠে তাঁর 'ভালো লেখবার' প্রচেষ্টায়, দুরূহ, দুর্ব্বোধ্য এমনকি উৎকট শব্দপ্রয়োগের চাপে। যে-অপূর্ব্ব মায়ার স্পর্শে অপ্রচলিত কি অপরিচিত শব্দ কবিতায় হঠাৎ প্রাণে উজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে, দুঃখের বিষয় সুধীন্দ্রনাথের সেটা আয়ত্তের বাইরে। ভাবের কোনো সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রকাশ করবার জন্য প্রশংসনীয় পরিশ্রমে অনেক শব্দ তিনি অভিধান থেকে কুড়িয়ে এনেছেন বটে, কিন্তু সেগুলো কিছু 'বলে' না।

তবে এটা যদি ধরে' নিই যে তিনি কবিতা লেখেন আত্ম-প্রকাশের অনিবার্য্য তাগিদে নয়, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা হিসেব, তা'হলে তাঁর এই 'অর্কেষ্ট্রা' বইতে অনেক ভালো জিনিস আবিষ্কার করতে দেরি হয় না। তিনি কবি যতটা, তার চেয়ে কারিগর ঢের বেশি; এবং কারিগরিতে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের প্রমাণ 'অর্কেষ্ট্রা'র প্রতি পাতায়। তার মানে এ নয় অবিশ্যি যে তিনি কেবলই কারিগর।

'লক্ষ-লক্ষ অদৃশ্য কিঙ্কিণী
অধীর-আগ্রহ-ভরে বিতরিলো দিকে দিগন্তরে
স্বর্ণপ্রভ কবোষ্ণ ঝঙ্কার।'
'—তোমার উড্ডীন কেশপাশ
মলয়ের তপ্তস্পর্শে ধান্যসম কেলিপরায়ণ'
'নশ্বর আশ্লেষে তার নিমেষের বিশ্ববিস্মরণ'

উদ্ধৃত পংক্তিগুলো যাঁর রচনা, তাঁর কবিত্বশক্তি অনস্বীকার্য্য। এ-সব স্থলে ছন্দের নিপুণ ঝঙ্কার কোনো বিশেষ একটি অনুভূতিকে ফুটিয়েছে, সে-অনুভূতি স্পর্শসহ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের একটি বিশেষ লক্ষণ। মোহিতলালের 'বিস্মরণী'র প্রধান গুণ ছিলো এটি। এবং যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি সুধীন্দ্রনাথ নিজের কাব্যে অঙ্গীকার করে'ই নিয়েছেন, সূক্ষ্মতরোরূপে মোহিতলালের প্রভাবও কম নয়। যে-ধরণের সাংস্কৃতিক বাক্যবিন্যাসে সুধীন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই সচেষ্ট তা যে কতদূর জীবন্ত, বেগবান ও ধ্বনিকল্লোলিত হ'তে পারে মোহিতলালই তা দেখিয়েছেন 'বিস্মরণী'তে। তিনিও এনেছিলেন অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ, কিন্তু তাতে প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছিলেন নিজের প্রতিভার জোরে।

ভাবের দিক থেকেও এ দুই কবিতে মিল আছে। উভয়েই দেহবিলাসী, ইন্দ্রিয়তান্ত্রিক। এর ফল প্রেম সম্বন্ধে যে-মনোভাব সেটা স্বভাবতই অগভীর। কিন্তু মোহিতলালের রচনায় মানুষের কাম কুমারসম্ভব দেব-বাসনার স্তরে গিয়ে পৌঁচেছিলো, তার কারণ তাঁর বীর্য্যবান পৌরুষ। সে-তেজ নেই সুধীন্দ্রনাথে। তাঁর কাব্যের প্রেম একবারের বসন্ত-বন্যায় নিঃশেষিত; তাঁর নায়ক-নায়িকা স্বীকার করে'ই চপল। এ-ধরণের প্রেম ভালো কবিতার বিষয় হ'তে পারে, অনেকবারই হয়েছে। হেরিক্, সক্লিঙ প্রভৃতি কবিতে এই বস্তুই আমরা পাই, রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'ও কি এই নিয়েই নয়! কিন্তু এই চপল প্রেমের প্রকাশও

চপল হওয়া উচিত। এ-প্রেমের কথা বলতে গেলে হেরিকের মতই প্রজাপতি-পাখায় সঞ্চালিত হ'তে হয়, 'ক্ষণিকার' চাপা হাসির লীলাতেই এ-রস ভালো জমে। সুধীন্দ্রনাথের গম্ভীর ও জটিল রচনা-ভঙ্গির সঙ্গে এই ভঙ্গুর দেহনির্ভর প্রেমের একটা ঘোরতর অসঙ্গতি আছে। হালকা করে' বললে যে-কথাটায় মজা লাগতো, অমন গুরু-গম্ভীর স্বরে বলাতেই সেটা যেন ঠেকে ঈষৎ ডিকাডেন্ট, 'নব্বুই সন' গোছের। এটা আরো বুঝতে পারি এই কারণে যে এই কথাটাই তিনি 'অর্কেস্ট্রা' কবিতার একটি গীতি-কবিতায় হালকা করে' বলেছেন ('খেলাচ্ছলে শুধিয়েছিলেম তোমার প্রেমে')—এবং সেখানে আমাদের উপভোগ কোথাও পীড়িত হয় না; সম্পূর্ণ, অকুণ্ঠ করে'ই ভালো লাগে।

সব দিক থেকে দেখতে গেলে, নাম-কবিতাটিই এ-বইয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। কবিতাটির সম্ভবত মস্ত উচ্চাশা ছিলো, সেটা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে বলতে পারিনে। একদিকে চলেছে সঙ্গীতের বর্ণনা; অন্যদিকে সেই সঙ্গীত যে-সব স্মৃতির ঢেউ তুলছে কবির মনে, চলেছে তারই প্রকাশ লিরিকের পর লিরিকে। এবং সেই লিরিকগুলো মিলে যেন কথা-ছাড়া সঙ্গীতকে মূর্ত্তি দিতে চাইছে ভাষায়। এই আলাদা জিনিসগুলো সুধীন্দ্রনাথ নিপুণ শিল্পের সঙ্গেই বুনেছেন একত্র করে'। লিরিকগুলো ছন্দের দোলায় কর্ণেন্দ্রিয়কে আদর করে। এবং দুটি তিনটি নিঃসন্দেহেই বঙ্গ-গীতির 'স্বর্ণ ভাণ্ডারে' স্থান পাবার যোগ্য। বলতেই হবে সুধীন্দ্রনাথ ওস্তাদ কবি: ছন্দ তাঁর সর্ব্বদাই নিখুঁত; এবং 'অর্কেস্ট্রা' কবিতার বর্ণনার অংশে আঠারো মাত্রা পয়ার নিয়ে তিনি যে-দুঃসাহসী পরীক্ষা করেছেন তাতে আমি বাস্তবিকই বিস্মিত হয়েছি। পয়ারে যতি-পাতের কতগুলো নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, তার ব্যতিক্রম হ'লেই কানে খটকা লাগে: যে-কারণে মধুসূদনের 'অকালে'র পর যতিপাত এত বড় মিরাক্‌ল্। সুধীন্দ্রনাথ এই পয়ারকে ভেঙে চুরে মুচড়িয়ে যেমন খুসি চালিয়েছেন, চালিয়ে নিতে

পেরেছেন একমাত্র 'আঁজাঁবমা'র জোরে—মধুসূদনেরও সেই জোরই ছিলো—এবং আমার কানে তো কোথাও বিশেষ খটকা লাগেনি। এ-ধরণের পরীক্ষা আরো করলে সুধীন্দ্রনাথ আমাদের পয়ারের পরিধি অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারবেন এ-বিশ্বাস আমার আছে।

সন্ধ্যালোকে—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। রামেশ্বর এণ্ড কোং।

সুরেশচন্দ্রের গদ্য-রচনার প্রতি আমার নিঃসঙ্কোচ ও প্রবল অনুরাগ। এবং সে-অনুরাগ আমি ইতিপূর্ব্বে নিবেদন করেছি। কিন্তু কবি-হিসেবে তাঁকে আমার বরাবরই মনে হয়েছে মাঝারি। 'বসনখানি শাসন করো অয়ি' লিখে যে-সময়ে তিনি নাম করেন সে-সময়ে বাঙলা কবিতায় যুবতীর স্খলিত বসনের প্রতি ইঙ্গিত বাস্তবিকই দুর্ল্ভ ছিলো, এবং চমক লাগিয়েছিলো সেইটাই। তা ছাড়া, সে-কবিতা (এবং সুরেশচন্দ্রের তৎকালীন প্রায় কবিতাই) ছিলো সত্যেন্দ্র দত্তীয় মৌতাতে ভরপুর; এবং সে-সময়টায় এ-দেশে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের আদর্শকেও ছাপিয়ে উঠেছিলো। সে-সময়ে সুরেশচন্দ্র যে-কবিখ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন সেটা অদ্যাবধি টিঁকে আছে।

'সন্ধ্যালোকে' তাঁর নতুন কবিতা- পুস্তক। বইখানা ছোট ও সুদর্শন। 'সন্ধ্যালোকে' কুড়িটি সনেটের সমষ্টি — এই বইয়ের প্রধান রচনা। সনেট বলতে হয় দয়া করে'। আসলে অতি সাধারণ নির্জীব পয়ারে চোদ্দ পংক্তির পদ্য। কোনোরকম বৈশিষ্টই নেই। প্রথম কবিতা 'সন্ধ্যা মায়াবিনী' চলনসই; মাঝে-মাঝে বালক-রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি আসে। অন্য কবিতাগুলো নিতান্তই অচল— সত্যেন্দ্রনাথের ভূত ভাঙা-ভাঙা গলায় কথা কইছে। অনেক আগ্রহ নিয়েই বইখানা পড়েছিলুম, হতাশ হ'তে হ'লো। সুরেশচন্দ্র কবি সন্দেহ নেই—গদ্যে কবি। এবং এ-ধরণের পদ্য আরো প্রকাশ করে' তিনি নিজের ক্ষতিই শুধু করবেন।

বুদ্ধদেব বসু

কবিতা

প্রথম বর্ষ চৈত্র, ১৩৪২ তৃতীয় সংখ্যা

হাওয়ার রাত

জীবনানন্দ দাশ

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল,—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
সারারাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারীতে খেলেছে;
মশারীটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌশুমী সমুদ্রের পেটের মত,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে;
এক একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—মাথার উপরে মশারী নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মত উড়ছে সে!
কাল এমন চমৎকার রাত ছিল।

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল—আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি;
অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশিরভেজা চোখের মত ঝল্‌মল্‌ করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা;
জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শালের মত জল্‌জল্‌ করছিল বিশাল আকাশ!
কাল এমন আশ্চর্য্য রাত ছিল।

যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে ম'রে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে ক'রে এনেছে ;
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ার, মিশরে, বিদিশায় ম'রে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে ক'রে
কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন,—

মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য ?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য ?
আড়ষ্ট—অভিভূত হ'য়ে গেছি আমি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন ;
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মত মুছে গিয়েছে কাল !
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে শাঁইশাঁই ক'রে,
সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মত !

হৃদয় ভ'রে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্তপ্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জ্জনের মত অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব
রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দ্দান্ত নীল মত্ততায় !

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মত গেল উড়ে,
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চল্‌ল একটা
দুরন্ত শকুনের মত।

আমি যদি হতাম—

জীবনানন্দ দাশ

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হ'তে যদি তুমি
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপ্‌ছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে ;

তাহ'লে আজ এই ফাল্গুনের রাতে
ঝাউয়ের শাখার পিছনে চাঁদ উঠতে দেখে
আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে
আকাশের রূপালি শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম ;—
তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখায় তোমার রক্তের স্পন্দন !—
নীল আকাশে খইক্ষেতের সোনালিফুলের মত অজস্র তারা,
শিরীষবনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মত
ফাল্গুনের চাঁদ।

হয়তো গুলির শব্দ :
আমাদের তির্য্যক্‌ গতিস্রোত,
আমাদের পাখায় পিস্‌টনের উল্লাস,
আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ার গান !

হয়তো গুলির শব্দ আবার :
আমাদের স্তব্ধতা,
আমাদের শান্তি।

আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না,
থাকত না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার ;

আমি যদি বনহংস হতাম
বনহংসী হ'তে যদি তুমি
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে।

হায়, চিল—

জীবনানন্দ দাশ

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাক' উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে !
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মত তার ম্লান চোখ মনে আসে !
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মত সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আন ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে
ভালোবাসে !
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদোনাক' ধানসিড়ি নদীটির পাশে ।

মহুয়ার দেশ

সমর সেন

(১)

মাঝে মাঝে, সন্ধ্যার জলস্রোতে
অলস সূর্য্য দেয় এঁকে
গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ,
আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর ফেনায় ।
সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতায়
ধোঁয়ার বঙ্কিম নিঃশ্বাস ঘুরে ফিরে ঘরে আসে
শীতের দুঃস্বপ্নের মতো ।

অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জ্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে ।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক্ মহুয়া-ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ ।

(২)

এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে
মাঝে মাঝে শুনি—
মহুয়া বনের ধারে কয়লার খনির
গভীর, বিশাল শব্দ
আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে,
অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক,
ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।

LO THE FAIR DEAD !
EZRA POUND

সমর সেন

(১)

শেষরাত্রে

অন্ধকারের নিঃশব্দ নদীতে যখন ভাটা এলো ভোরের দিকে,
এলোমেলো দীর্ঘশ্বাসে
ঠাণ্ডা হাওয়া দিলো অনেক, অনেক, দূর থেকে,
তখন বাইরে এলাম;
গম্ভীর শূন্যতায় কতো অস্পষ্ট তারার অসহ্য সৌন্দর্য্য—
এই আকাশের পিছনে কি কাঁপছে
নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন?
একটি বেগুনি রঙের মেঘ দিগন্ত ছেড়ে উঠল,
তার হঠাৎ চঞ্চলতায়
প্রাচীন ভাস্কর্য্যের অচঞ্চল গভীরতা আঁকা।

ঘুম আস্‌ছে না, হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে অস্পষ্ট শুনি—
দূরের কোন্ কুটিরে কান্নার শব্দ,
ঘুঙুরের ধ্বনি,
মাতালের স্খলিত চীৎকার;
ঘুম আসছে না,
রাত্রিশেষে কলের বাঁশীর তীব্র হাহাকার
ধ্বনিত হোলো দিগন্ত থেকে দিগন্তে।

(২)
ভোরের কলকাতা

রিক্‌শার উপরে ক্লান্ত চীনে গণিকা যখন চোখ বোজে
সূর্য্যের অলস উত্তাপে,
তখন দিন-রাত্রির নিঃশব্দতা
তোমার রক্তে আসে
নীল নদীর মতো।

কত ধূসর চোখে অশ্লীল, নাগরিক আনন্দ,
পিচের পথে
অগণিত মানুষের ক্লান্ত পদক্ষেপ।

(৩)
আমন্ত্রণ

রাত্রির শেষে
রাস্তার ধূলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে
ধাবমান মোটরের উদ্ধত বেগ :
চারদিকে ব্লিচিং পাউডারের তীক্ষ্ণ গন্ধ।
"তুমি কি আজ আসবে ?"
—নীল, নীল চোখে শরীরের শেষহীন প্রশ্ন,
ভিজে ফুলের মতো নরম প্রেম—
"নিশ্চয়ই আসব"—
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তা ছাড়া একসঙ্গে রাত্রে শোবার
দুর্লভ সুযোগ!

কিন্তু কি হবে তোমার কাছে এসে!
সময় কাটে,
সময় কাটে ট্রামের অবিরাম মুখর শব্দে,
অধ্যাপকদের আর্ত্তনাদে,
আর সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার আমন্ত্রণে সময় কাটে,
সময়ের তীক্ষ্ণ তীর উদ্দাম আমাদের দিকে,
কি হবে, কি হবে তোমার কাছে আসার দুর্লভ সুযোগে—
অন্ধকারের ভারে আকাশ যখন নিঃশব্দ ?

(৪)

নাগরিকা

প্রান্তরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে
একটি ক্লান্ত শ্বেতাঙ্গিনী আলোয় থম্‌কে দাঁড়ালো ;
তার পরে শীর্ণহাতে
অলস, অলসভাবে ঠোঁটে মাখালো রং,
আর পাউডার মুখে ;
উপরে আকাশে যতদূর চোখ যায়—
শুধু নীল অন্ধকার।

—যদি এখনি এখানে গভীর সমুদ্র নামে,
যদি এখনি মুছে যায় এই মসৃণ পিচের রাস্তা,
এই ঠাণ্ডা, সবুজ ঘাস,
যদি এক মুহূর্ত্তে মুছে যায় আমার চোখের ক্লান্তি
বিশাল শূন্যতা থেকে-আসা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ;
আর চারদিকে নামে শুধু আকাশের মতো বিস্তীর্ণ সমুদ্র,
তা হলে আমার সমস্ত শরীরে কি আবার চকিতে আসবে—
সমুদ্র-মদির উর্ব্বশীর স্বপ্ন ?

(৫)

মৃত্যু

ধূসর পথে অন্ধকার, দীর্ঘ গাড়ী,
মন্দিরের বিবর্ণ দুঃস্বপ্ন,
লজ্জাহীন গণিকার সলজ্জ প্রণয় :

সূর্য্য অস্ত গেল, সূর্য্যদেব কোন দেশে—
এখানে সন্ধ্যা নামলো,
শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুল্‌ছে শূকরের চামড়ার মতো,
গলিতে গলিতে কেরোসিনের তীব্র গন্ধ,
হাওয়ায় ওড়ে শুধু শেষহীন ধূলোর ঝড়;
এখানে সন্ধ্যা নামলো শীতের শকুনের মতো।

মধ্যরাত্রে
ধাবমান ট্রেনের মন্থর শব্দ ;
আমাদের মৃত্যু হবে পাণ্ডুর মতো।

কাল রাত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমি ত এখানে বসে
তোমার স্বপন দেখি,
তুমি কি করিছ, জানি নাক'।
আমি ত মুহূর্ত্ত-স্রোতে চলেছি উজান ঠেলে
যেখানে কাঁপিছে কাল রাত।

তোমার স্বপন দেখি,
সে স্বপনে তুমি কতটুকু!
এক গুছি চুল,
কানের দুলের পাশে
নেমেছে শিথিল হয়ে
মেদুর মেঘের রাত থেকে

আর লঘু
অতি লঘু হাসি,
—শব্দ নয়;
মশলার দ্বীপ থেকে ভেসে-আসা গন্ধ-শ্বাস
পলাতক, অপ্সরা-অস্ফুট।

কত যে সাগর আছে;
কতদুর পৃথিবীর তটে
আছাড়িয়া পড়ে রাত দিন।
আমি জানি তার চেয়ে
উতল সাগর এক,
—তার মাঝে চেতনা বিলীন।

টেবিলেতে স্তূপাকার
কত কাজ কত যে ভাবনা।
পৃথিবী ত মানে নাক'
পৃথিবী ত জানে নাক'
কাল এক রাত এসেছিল।

কাজের কলম চলে;
আমার হৃদয় চলে
মুহূর্ত্ত-স্রোতের সাথে যুঝে,
যেখানে নিবিড় রাত
যেখানে গহন রাত
কাঁপে কাল
তোমার আমার।

তুমি এস

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এই নেভালেম আলো ;
ঘরে এল তৃতীয়ার
চাঁদ-ছোঁয়া মদির আঁধার ।
তুমি এস এইবার
এ প্রতীক্ষা পূর্ণ করো
হয়েছে সময় ।

নয়ন এড়ায়ে এস
পদপাত যাবে নাক শোনা ;
স্পন্দিত আঁধারে
শুধু রক্তে যাবে জানা
স্বপন-নিশ্বাস তব
পড়িয়াছে মুদিত নয়নে ।

চুলগুলি নুয়ে পড়া
ঘুমের ঝুরির মত
ছুঁয়ে থাক্ আতপ্ত কপোল ।
তোমার আঙুলগুলি
রহস্য-কোমল ঢেউ
হৃদয়ের তট-শেষে তোলে ।

পাতা-ঝরা অরণ্যের
পদমূলে বাতাসের
মর্ম্মরের মত,
ক্ষীণ তন্দ্রাতুর স্বরে
কাঁপিবে চেতনা মোর
মূর্চ্ছার সীমায় ।

চাঁদ-ছোঁয়া অন্ধকারে
নাই হ'লে শরীরিণী ;
স্বপ্ন-তনু স্মৃতি
আমারে ঘিরিয়া থাক
বাতাসে জড়ায়ে ওঠা
কুহেলিকা-সুরভির মত ।

নীল দিন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কত বৃষ্টি হয়ে গেছে,
কত ঝড়, অন্ধকার মেঘ
আকাশ কি সব মনে রাখে !
আমারও হৃদয় তাই
সব কিছু ভুলে গিয়ে
হ'ল আজ সুনীল উৎসব !

তুমি আছ, তুমি আছ,
এ বিস্ময় সওয়া যায় নাক ;
অরণ্য কাঁপিছে।
মনে মনে নাম বলি,
আকাশ চুইয়ে পড়ে
গলানো সোনার মত রোদ

গলানো সোনার মত
রোদ পড়ে সব ভাবনায় ;
সোনার পাখায়
গাহন করিতে ওঠে
নীল বাতাসের স্রোতে
রৌদ্রমত্ত পায়রার ঝাঁক।

এ নীল দিনের শেষে
হয়ত জমিয়া আছে
সূর্য্য-মোছা মেঘ রাশি রাশি।
তবু আজ হৃদয়ের
ভরিয়া নিলাম পাত্র
এই নীল স্বপ্নের সুধায়।

হৃদয়েরে কত পাকে
স্মরণ জড়ায়ে রাখে
মরণ শাসায়।
তবু মুহূর্ত্তের ভুল
ক্ষীণায়ু স্ফুলিঙ্গ তবু
অন্ধকারে হাসিয়া উঠুক।

শীতল শূন্যতা হতে
উল্কা আসে পৃথিবীর
নিষ্করুণ নিশ্বাসে জ্বলিতে ;
স্তেপির দিগন্তে দেখি
আগু-পিছু তুষারের
মাঝখানে ফুলের প্লাবন।

তোমার নয়ন হতে
আজিকার নীল দিন
জীবনের দিগন্তে ছড়ায় ;
মিছে আজ হৃদয়েরে
স্মরণ জড়াতে চায়
মরণ শাসায়।

—'যায় নাই, যায় নাই,
নব-নব যাত্রী-মাঝে রয়েছে সদাই।'

বুদ্ধদেব বসু

ভুবনেশ্বরে প্রার্থনা

বৃষ্টি কেটে গেছে,
আকাশে ছেঁড়াখোঁড়া সাদা মেঘ,
রোদের ঝিলিমিলি তার ফাঁকে।

বাতাসে প্রথম শীত,
বাতাসে ধার ;
দিঘির নীল জল উঠছে শিরশিরিয়ে
যেন কোনো হৃদয় ভালোবাসার ভার আর সইতে পারছে না।

বৃষ্টি কেটে গেছে,
আমরা স্নান করে' এসেছি।

আমরা স্নান করে' এসেছি
আঁকাবাঁকা গ্রামের পথ দিয়ে,
দু' দিকে মাঠ দিগন্ত ছোঁয়-ছোঁয়,
মাঝখানে ঠাণ্ডা জলের ঝরনা,
আর পায়ের নিচে কাঁকর।

বৃষ্টি কেটে গেছে।

আমরা ডুব দিয়েছি ঝরনার জলে
ঝরনার উৎস-মুখে ;
ফুলের মত মেলে' দিয়েছি আমাদের শরীর
এই নতুন শীতের নতুন স্বর্য্যের দিকে।

এই নতুন-নীল আকাশের দিকে
চারদিক থেকে উঠেছে হাজার মন্দিরের চূড়া
মাঝখানে নির্ম্মম ভুবনেশ্বর।

বৃষ্টি কেটে গেছে,
আমরা স্নান করে' এসেছি।

সমুদ্র আর দূরে নয়,
আজ বিকেলে আমরা সমুদ্রের কাছে গিয়ে দাঁড়াবো।

আর আজ এই নতুন স্বর্য্যের আলোয়
হাজার মন্দিরের পাথরের ছন্দে
একটি প্রার্থনা আমরা এঁকে গেলাম
একটি প্রার্থনা আমরা রেখে গেলাম

—তারপর সমুদ্র।

সমুদ্র-স্নান

আমরা দু'জন আজ সমুদ্রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি
আজ এই প্রথম শীতে।

গেলোবারের শীতে তুমি আর আমিই তো ছিলাম ;
তারপর প্রথম গ্রীষ্মের উষ্ণ-মদির বিরহ ;
তারপর বর্ষা।
বর্ষায় তো আবার তুমি আর আমি।
আমরা ভেদ করে' এলাম মানুষের দেয়াল
পায়ের নিচে মাড়িয়ে এলাম সমস্ত পৃথিবী
কিছু না-ভেবে, কোনো ভয় না-করে'।
তারপর এই এবারের প্রথম শীতে
সমুদ্রের কাছে তুমি আর আমি।

তুমি আর আমি সমুদ্রের বুকের উপর,
ঢেউগুলো আমাদের মারছে,
মুখে লাগছে লোনা জলের ছিটে।
তুমি আর আমি ঢেউয়ের দোলনায় নাচছি,
দু'দিকে উঁচিয়ে-ওঠা ঢেউ
যেন আমাদের আড়াল করছে সমস্ত পৃথিবী থেকে।

আমরা এই সমুদ্রের আর এই উষ্ণ মধুর সূর্য্যের,
সাদা মেঘের আলপনা-আঁকা আকাশ
মাথার উপর ছড়ানো ;
সমুদ্র ধু-ধু করছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে
যেন চিরকাল এক বিরাট মুহূর্ত্তে প্রসারিত ;
চিরকালের বুকের উপর আমরা দুলছি।

আমরা ভাসছি, আমরা নাচছি,
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে, ফেনার ঘূর্ণিতে,
মাথার উপর সাদা পাখির ঝাঁক
চাকার মত ঘুরছে :
উঁচু হ'য়ে উঠে গেছে সমুদ্র
যেখানে চোখ যায় না।

এই সমুদ্র, এই নির্ম্মম বন্ধ্যা সমুদ্র
এ-ই তো একদিন জন্ম দিয়েছিলো আমাদের পৃথিবীকে।
সৃষ্টির আগে, সময়হীন মহাসমুদ্রে
সৃষ্টির দেবতার অনন্তশয়ন।
তারপর তাঁর নাভিপদ্ম থেকে ফুটে উঠলো এই পৃথিবী,
ফুটলো সূর্য্য, অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় পদ্ম।

সেই সমুদ্রের বুকেই তো আমরা আজ শুয়েছি
তুমি আর আমি।
আমরা নাচছি, আমরা দুলছি
ঢেউয়ের উন্মত্ত দাপাদাপির মাঝখানে,
আমাদের সমস্ত শরীরে সমুদ্রের আর সূর্য্যের চুম্বন।
আমরা উন্মুক্ত, আমরা নগ্ন,
সমুদ্রের আর সূর্য্যের কাছে লজ্জাহীন :
ফুটে উঠুক, কিছু ফুটে উঠুক
তোমার আর আমার সংস্পর্শে, তোমার আর আমার মাঝখানে
যেমন একদিন পৃথিবী ফুটে উঠেছিলো পদ্মের মত
বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে।

হোক্ তা পদ্ম।
শুধু একটি পদ্ম।
আমাদের দু'জনের শরীর তার যুগল-মৃণাল।
কে জানে হয়-তো তা নতুন এক পৃথিবী,
কে জানে হয়-তো তা স্বপ্নের সার্থকতা, কল্পনার ইন্দ্রধনু,
কে জানে হয়-তো তা নতুন কীর্ত্তির মহিমা,
হয়-তো শুধু কথার ছন্দ,
হয়-তো শুধু অশ্রু আর চুম্বন
তা ছাড়া কিছু নয়।

তা যা-ই হোক্ না, তা-ই হবে নতুন
তা-ই হবে আশ্চর্য্য
সদ্য-ফুটে-ওঠা পদ্মের মত।
মেলে দেবে আকাশের নিচে হাজার পাপড়ি
ছন্দের রেখায়, রঙের সুষমায়
কত কথায়, কত কাজে,
দিনের পর দিন অশ্রুতে আর চুম্বনে,
রাত্রির পর রাত্রি উষ্ণ বিরহে,
কান্নায় আর সুখে, আশায় আর কল্পনায়
আর শেষ, নিঃশেষ পরিপূর্ণতায়।
কিছু ফুটে উঠুক, কিছু বেরিয়ে আসুক,
তোমার আর আমার মাঝখান থেকে, এই সমুদ্রের বুকের উপর;
তা যা-ই হোক্ না, তা-ই হবে আশ্চর্য্য, তা-ই হবে নতুন :
তা ফেটে বেরিয়ে আসুক আমাদের মিলনের বুকের ভিতর থেকে
আজ এই সমুদ্রের বুকের উপর।

হ্রদের ধারে শান্তি

এখানে, এই সবুজ হ্রদের ধারে
যেন অনেকদিনের হারানো কোনো বন্ধুকে ফিরে পেলুম—
ঠিক বুঝতে পারছি না, কে।

বুঝতে পারছি না।
বুঝতে যে পারছি না সেটাই তো ভালো।
শুধু বুকের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আনন্দ, আবছায়া ভয়—
যেন নতুন স্ত্রী খুলে ফেলছে তার সাজ
রাত্রির অন্ধকারে, হাতের চুড়ি বাজিয়ে;
অন্ধকারে বসে' শুনছি।

কী যে হারিয়েছিলাম, কী যে ফিরে পেলাম।
সে কি এই স্তব্ধতা,
কলকাতার ট্র্যাফিকের গর্জ্জন আর সমুদ্রের গর্জ্জনের পরে
এই জীবন্ত, ভীষণ স্তব্ধতা?
সে কি এই তারায় ছাওয়া আকাশ,
না কি নতুন চাঁদের বাঁকা রেখা,
না কি ঐ যে রেল-লাইন বেঁকে গেছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে
তারই দিগন্ত-ইঙ্গিত?

এই শুধু জানি, সমস্ত বুক আমার ভরে' গেলো
এখানে, এই হ্রদের ধারে।
তাকিয়ে-তাকিয়ে পলক পড়তে চায় না চোখের—
আকাশ ভরে' এত তারা সাজানো।

একটু পরে মান্দ্রাজের গাড়ি এসে দাঁড়াবে
চাকায়-চাকায় স্তব্ধতাকে আগে-আগে ঝেঁটিয়ে;
কাল ভোরে সে কলকাতায়।
কিন্তু কলকাতা এখন কত দূরে
কলকাতাও কত দূরে এখন।
কত দূরে এইমাত্র-শেষ-হওয়া যুদ্ধের ঝননা।

ডাক

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

তার সাথে আর হয় না আমার দেখা,
কী জানি সে এখন কোথায় থাকে ;
নিশীথ রাতে তারার চিত্রলেখা
তবু আমায় তার কাছে আজ ডাকে।
হয়তো সেদিন শুধুই দেহের টানে
তাকিয়েছিলো সে মোর মুখের পানে।
ফাগুন কেবল বাহ্য বরদানে
কল্পলতার কান্তি দিলো তাকে।
আজকে তবু আত্মা আমার একা,
জানিনা আর কোন্‌খানে সে থাকে ॥

বুঝেছিলেম সেদিনে, আজ আবার
এই কথাটাই নূতন ক'রে বুঝি
ইচ্ছা ছিলো তার কাছে যা পাবার
সেই অমৃত করেনি সে পুঁজি।
তার ছিলো যা, সব জীবেরই আছে,—
সেই ঋজুতা য়ুকালিপ্‌টাস্‌ গাছে,
তেমনি ক'রেই মত্ত ময়ূর নাচে,
সেই প্রদাহ পশুর চোখেও খুঁজি।
যৌন জাদু নিমেষে হয় কাবার
বুঝেছিলেম সেদিন, আজও বুঝি ॥

তবু যখন মধুফুলের বনে
জড়িয়ে ভুজে অদৃশ্য তার কায়া
অতল কালো ডাগর সে-নয়নে
দেখেছিলেম তারার প্রতিচ্ছায়া,
তখন যেন হঠাৎ নিজের মাঝে
শুনেছিলেম সৃজনসেতার বাজে,
ভেবেছিলেম মুঠোর ভিতর রাজে
বিশ্বরূপের অপরিসীম মায়া।
হিরণ্ময়ের কিরণ আহরণে
সহায় ছিলো অদৃশ্য এক কায়া ॥

বসন্ত আজ সুদূর পরাহত,
হেমন্ত ওই দোদুল অন্ধকারে ;
চুকিয়ে দিয়ে পাওনা দেনা যত
দাঁড়িয়ে আছি খেয়াঘাটের পারে ;
চপল ভ্রমর অন্ধ নেশার ঝোঁকে
আর ফিরে না প্রলাপ ব'কে ব'কে,
মনের চাকের মধুর নিরালোকে
পাড়িয়েছি ঘুম শেষকালে আজ তারে।
তত্ত্বকথাই কেবল ওতপ্রোত
এই নিরাকার নিখিল অন্ধকারে ॥

তবু আবার তারার প্রদীপ জেলে
আমায় প্রাচীন সঙ্কেতে সে ডাকে ।
এগিয়ে গেলে জ্ঞানের বোঝা ফেলে
তার দেখা কি পাবো পথের বাঁকে ?
আজ বুঝেছি সেদিন ক্ষণিক ভুলে
যদৃচ্ছ দান দিইনি তারে তুলে,
তীর্থে যেতে চপল চরণ-মূলে
কাটাইনি কাল দৈবদুর্ব্বিপাকে ।
সত্য কেবল দেহের দয়ায় মেলে,
তাই সে আমায় ডাকে, আবার ডাকে ॥

বীণাপাণি

যুবনাশ্ব

আমার গান
ভালো লেগেছিল তোমার,—পথ-চলার দিনে ।
আমি কি গাইতে পারি ?
তোমার ভালো লাগা দিয়ে আমার ছেঁড়া তারে ফেরালে সঙ্গীত,
তুমি বীণাপাণি !

ক্ষণেকের তরে
পথ চলার অবসরে, তোমার সঙ্গে
অল্প পরিচয় ।
তবু আমায় করে নিলে আপন নিজ প্রাণের প্রণয়ে,
আমাকে ভালোবেসে নয়, আমার গানকে ভালোবেসে ।
সার্থক হোলো আমার গান
তোমার অঙ্কলীন বীণাতে উন্মাদনা তুলে,
উঠলো রণন ঝনন ।
লাগলো গানের ব্যথার প্রলেপ তোমার উদাস প্রেক্ষণে ।
ত্রিলোকে ঠাঁই খুঁজে বেড়ালো যে গান
তারে তুমি স্থান দিলে,
তুমি বীণাপাণি !

আজ
গান থামার স্তব্ধ অবসরে
সন্ধ্যার মতো নিবিড় করে ছেয়ে আসে তোমার স্মরণ।
ঘনায়মান মেঘের বুকে বাসা বাঁধে
চোখের নীলাঞ্জন,
ক্ষণে ক্ষণে
নক্ষত্রের কুন্ঠিত দ্যুতিশিহরণে
জাগে তোমার কম্পিত ওষ্ঠের মূক সম্ভাষণ।
ছায়াপথের চিরচলন্ত মিছিল থমকে দাঁড়ায়,—
খোঁজে—
তোমাকে নয়, তোমাকে নয়
তোমার বুকে আমার গানকে।

পরিশেষ

যুবনাশ্ব

দুপুরের দাবদাহ দীর্ণ করে,
উঠলো আর্ত্তনাদ তৃষার্ত্ত চাতকের কণ্ঠে,—
মনে হোলো
বিদ্যুৎ ঝলকে চিড় খাওয়া আকাশের মতো
প্রকৃতির বুকে
বুঝি আঁকলো ব্যথার জ্বালার লেখা।

মুহূর্ত্তের জন্য
মনে হোলো, অগ্নিবর্ষী মার্ত্তণ্ডের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে
পড়লো করুণার পলক।

মুহূর্ত্তের জন্য
নভোচারী চিলের পক্ষসঞ্চালন
স্তব্ধ হোলো স্তম্ভিত সমবেদনায়।

মুহূর্তের জন্য
বুঝি উঁকি দিলো অনন্তের আলিঙ্গন থেকে
বারিবাহিনী দিক্‌বালারা,—
মাথায় মেঘের গাগর।

তৃষ্ণার্ত্ত চাতক
প্রশান্তি পরিবেষণের পরিহাসে প্রলুব্ধ,
ঝাঁপ দিলো মৃগতৃষ্ণিকার মরণামন্ত্রণে।

কবিতা

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

যে আলো পেরিয়ে এল কালের পারাবার
ছাপিয়ে এল অনন্ত আকাশ—
তীক্ষ্ণ আলো—তীব্র আলো—উজ্জ্বল আলো—
যে আলো ধূসর হয়ে এল ধরণীর কাছে এসে—
ধূলোর মধ্যে জমাট হোলো, হারিয়ে গেল যেন—
হোলো মলিন—ক্রমশ হোলো কালো—
ঘোর কালো মাটির ছায়া লেগে—
সেই কালো—সেই আলোরই রঙ্‌ সেও।
সেই আলোই কি হোলো শেষে কবিতা—
তোমার খাতায় আর আমার খাতায়, বন্ধু ?

কবির কবিতা চুরি করে' লুকিয়ে রাখে পৃথিবী—
হয়তো নিজে কবি হবার সাধে।
একদিন হঠাৎ কাব্য করে জাহির।
সেদিন দেখি তার ঘাসের মাথায়, গাছের পাতায়
আলোর খেলা।
ফুলের সাজি তারাবাজির সঙ্গে পাল্লা ছায়।
পৃথিবী চম্‌কে ছায় আকাশকে—
কবিতা চমক লাগায় কবির।

পৃথিবীর পাতা থেকে যখন আমি আবার
চুরি করি সেই কবিতা—আমি, পৃথিবীর মানুষ,—
তখন তার আলোর কতটুকুই আমি ধরতে পারি
আমার জীবনে—আমার কবিতার খাতায় ?
কিন্তু, আলো-কে হারাতে দাও বন্ধু !
কতই রশ্মি তুমি ধরে' রাখ্‌বে বলো ?
আলো যত হারায় ততই রূপের দানা বাঁধে—
রশ্মিকণা কখন্ পরে ফুলের ছদ্মবেশ—
কবির সঙ্গে কবিতার চলে লুকোচুরি !
আলো না হারালে হয় না ভালো কবিতা।

গ্রামোফোন

পরিমল রায়

কী নিরর্থক মানুষের তৈরী এই গ্রামোফোন
আর কী নিরর্থক তা'তে আবার গান শোনা !

সন্ধ্যেবেলার মিঠে অন্ধকার আসছিলো ঘনিয়ে,
বাতাসে আধ-ফোটা চাঁদের মৃদু গন্ধ।
কী যেন সেদিন হয়েছিল তোমার,
আরাম-কেদারায় চুপ করে' শুয়ে' ছিলে তুমি,
চোখে-মুখে যেন একটা করুণ দুঃস্বপ্নের ছায়া।
আমি কৃপণের মত সেদিনকার সোনালী সন্ধ্যার
মধুর অলসতা একটু-একটু করে' গা'য়ে মাখছিলাম,
আর ভাবছিলাম, এই মুহূর্ত্তগুলি জীবনে আর আসবে না।

হেনকালে ধূমকেতুর মত উদয় হলেন গিরীনবাবু,
যাঁকে দেখলে তোমার নাকি ভয় হয়,
আর আমি শামুকের মত খোলসের আশ্রয় খুঁজি ;
যিনি অপরের স্নায়ু-তন্ত্রে
খেয়াল-মত বোল ফোটাতে ভালোবাসেন,
আর ভালোবাসেন চীৎকার করে' কথা কইতে
—অবশ্যই বাজে কথা, যার প্রায়ই অভব্য।

উপবিষ্ট হলেন গিরীনবাবু,
অলক্ষ্যে দেখলাম,
ভীরু পাখীর মত তোমার চোখ দু'টি
যেন ঝড়ের আশঙ্কায় বিব্রত!

ঘরের এক কোণে ছিল গ্রামোফোনটা,
গিরীনবাবু বল্লেন, চলুক না ওটা,
ঘুরলো রেকর্ড, স্থরু হ'লো গান,
পশ্চিমী ওস্তাদের হাতে বেজে উঠলো বীণ্।
মুহূর্ত্তে স্থরের ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে গেল চারদিকে,
কণ্ঠময় স্বরস্রোত, শূন্যময় বিপুল মূর্চ্ছনা,
অপূর্ব্ব শব্দসম্ভারে মুগ্ধ হ'লো মন,
বিহ্বল হ'লো বুদ্ধিরহিত চেতনা।
স্বপ্ন, স্বপ্ন আর স্বপ্ন!
তোমার চোখে ধরেছে তখন ঘুমের নেশা,
কিসের যেন সমারোহ আমার মনে,
অস্ত-সূর্য্যের ক্ষীণতম রেখাটির মত
স্থরের বিচিত্র স্রোতে ঈষৎ-আন্দোলিত তোমার দেহ।

হঠাৎ কোত্থেকে এ কী বীভৎস চীৎকার!
চমকে চেয়ে দেখি, গিরীনবাবু অট্টহাসি হাসছেন,
মুখে একটা অশিষ্ট কুতূহলের অশ্লীল ব্যঞ্জনা,
গানের কোথায় যেন ভারী একটা মজা পেয়েছেন,

কুৎসিত মনে কিসে যেন লেগেছে
অসহ্য একটা সুড়সুড়ি!

ছিঁড়লো ইন্দ্রজাল
ধ্বসে' চুরমার হ'লে স্বপ্ন,
শব্দের আর স্থরের অরণ্যে লাগলো আগুন,
পুড়ে' ছাই হলো স্বপ্নের ইমারত।
তুমি আরাম-কেদারা ছেড়ে উঠে গেলে,
বোধ হয় অন্তঃপুরে,
আমি তখন শামুকের খোলস হাতড়াচ্ছি।

কিন্তু নিতান্তই বর্ব্বর এই গ্রামোফোন,
নিতান্তই এ দম দে'য়া কল!
স্থরের একটু হ'লো না বিকৃতি,
পশ্চিমী ওস্তাদ হোঁচট খেলো না একটুও,
তার হ'লো না কোনো ধৈর্য্যচ্যুতি।
দুঃসহ নিয়মানুবর্ত্তিতায় গান চললো এগিয়ে,
—আজ এই মুহূর্ত্তে সে গিরীনবাবুরও ক্রীতদাস।

মিস্—

অজিত দত্ত

কলঙ্ক-কঙ্কণ ভাঙো ! ও কেবল ভূষণ তোমার।
বারবার সকলের চোখের উপরে তাই বুঝি
সেই তব কলঙ্কের ঐশ্বর্য্যের মহামূল্য পুঁজি
ঢঙে আর ন্যাকামিতে নানাভাবে করিছ প্রচার।
দ্রৌপদীর কথা ভাবি' মনে আনিয়ো না অহঙ্কার
উষাকালে তব নাম মানুষ স্মরিবে চোখ বুজি',
দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য তব, রাহুময় তোমার ঠিকুজী,
সেথায় নক্ষত্র নাই অনির্ব্বাণ স্মরণীয়তার।

কলঙ্ক-ভূষণ খোলো ! বহু প্রেম গর্ব্ব যদি চাহ—
যদি ভালোবাসিবার শক্তি থাকে, প্রিয়তম মাঝে
ভাখো তবে পার্থ-ভীম-যুধিষ্ঠিরে, পঞ্চ পাণ্ডবেরে ;
যে-কলঙ্কে লুব্ধ করি' বহু হ'তে বহুতরদেরে
উর্ণায় টানিতে চাও—সে-ভূষণ নারীরে না সাজে,—
বিশ্বাস করিতে পারো, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বিবাহ।

বিবমিষা

বিষ্ণু দে

তোমাকে রাখিয়া দূরে তবে মোর চিত্ত প্রাণ রাখে
তোমাকে দেখিলে রী-রি করে মোর চক্ষুস্নায়ুশিরা
তোমার নিশ্বাস হানে বিষবহ্নি মোর নাসিকাকে
তোমার কথায় মোর বুদ্ধি পায় নিদারুণ পীড়া।
তুমি ক্লিন্ন অস্থিহীন কদর্য্য স্বেদাক্তত্বক্ সাপ।
গির্‌গিটির স্পর্শ পাই তোমার ও জঘন্য আঙুলে।
সামুদ্রিক পীড়া তুমি মোর সারা দেহ ওঠে দুলে,
ঘৃণার তরঙ্গ শুচি পুণ্য করে উদ্গারের পাপ।

অবজ্ঞায় অবগাহি' লভিলাম প্রাণের বিস্তার।
ভাগ্য তব মোর হাতে। অদৃষ্টের দৃপ্ত পরিহাসে
নিজ অপঘাত পাও দেখিতে কি ? শোনো হাহাকার ?
ঘৃণা মোর সুগভীর—ঘৃণার এ সমুদ্রের পাশে
প্রেম যে গোপদ স্বল্প শুষ্কপ্রায় ক্ষীণ দীর্ঘিকার।

গদ্য ছন্দ

বাঙলা গদ্য ছন্দ সম্বন্ধে সচরাচর এই ধরণের সব মন্তব্য শুনতে পাই :

১) কবিতা লেখা এতদিনে সহজ হ'লো।

২) ইংরিজি ফ্রী ভর্সের মতো এ কিছুই হচ্ছে না।

৩) এর কি প্রকৃতই কোনো সার্থকতা আছে, না কি এ একটা নতুন ফ্যাশান মাত্র? যদি কোনো সার্থকতা থাকে, সেটা কী?

১) অত্যন্ত কাঁচা কথা। কবিতা লেখা সহজ মোটেও হয়নি। যেখানে যত বেশি স্বাধীনতা সেখানে তত বেশি দায়িত্ব; এবং সেই দায়িত্ব-রক্ষা স্বাভাবিক ক্ষমতা ও অর্জ্জিত শিক্ষাসাপেক্ষ। কাব্যক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগী পদ্যে লিখলেই ভালো করবেন; তাতে পা পিছলোবার জায়গা কম। তৃতীয় চতুর্থ ইত্যাদিশ্রেণীর রচনা পদ্য ছন্দের খুঁটি ধরে'-ধরে' কোনোরকমে যদি বা চলতে পারে, গদ্যের খোলা আঙিনায় তার জায়গাই নেই। পদ্যের মিল ও ছন্দের কৌশলই সহজ, ও সাধারণের অধিগম্য।

২) ইংরিজি ফ্রী ভর্সের সঙ্গে বাঙলা গদ্য ছন্দের কোনোই সম্পর্ক নেই। এ-কথাটা খুব ভালো করে' বোঝা দরকার। ফ্রী ভর্স কথাটাই বলছে যে সে ভর্স—মানে পদ্য ছন্দ—metre।* বাঙলা গদ্যছন্দ গদ্য, ভর্স নয়, তাতে metre নেই। গদ্যে লেখা কবিতা; খাঁটি গদ্য।

* হুইটম্যান ও অন্য কোনো-কোনো আমেরিকান কবির গদ্য কবিতা এ-প্রসঙ্গে ধরছি না। যদি ইংরেজির ক্ষেত্র থেকে দৃষ্টান্ত আনতে হয়, ডি, এইচ্‌, লরেন্সের শেষের দিকের গদ্য কবিতাগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

৩) আলোচনার যোগ্য। জায়গা কম; সংক্ষেপে বলি। পদ্যে ছন্দের ও মিলের খাতিরে অকারণ কথা, বাড়তি শব্দ, অর্থহীন বিশেষণ প্রভৃতি বসাতে হয় কখনো-কখনো মহৎ কবিকেও। যা বলতে চাইনে তা বলা হ'য়ে যায়; আসল যেটা বলতে চেয়েছিলুম সেটা হয়তো দূরে পড়ে' রইলো। (কথাটা কবিতার পাঠকরা বুঝতে না পারেন, কিন্তু যিনিই কখনো কবিতা লেখায় হাত দিয়েছেন, তিনিই উপলব্ধি করবেন।) সুতরাং কবিতাকে একটা স্তরে নিয়ে যাওয়া যাক্‌ যেখানে ও-সব বাহুল্য অনায়াসে ছেঁটে ফেলতে পারবো; ঠিক যেটুকু বলতে চাই সেটুকু বলবো; যা বলতে চাইনে তাকে মোটে জায়গাই দেবো না। বাঙলায় এর উপায় গদ্যছন্দ। এ-প্রসঙ্গে পাউণ্ড প্রভৃতির ইমেজিষ্ট ম্যানিফেস্টো স্মরণীয়।

২

গদ্য কবিতা লিখতে এই নিয়মগুলো আমরা মেনে চলি :

১) বাক্যবিন্যাস ঠিক গদ্যের—মুখের ভাষার—মত হবে। কোনোরকম 'পোয়েটিক লাইসেন্স' নেই।

২) শব্দচয়নও তা-ই। গদ্যে চলে না, এমন কোনো কথা অব্যবহার্য। [সাধারণত বাঙলা পদ্য কবিতায়—এমনকি গদ্যে—সকল বিশেষ্যপদের বহু সংস্কৃত প্রতিশব্দ স্বীকৃত। সে-সব প্রতিশব্দ একেবারে বর্জ্জনীয়। হাতকে হাতই বলবো; আকাশকে আকাশ, রাত্রিকে রাত্রি, সমুদ্রকে সমুদ্রই বলবো। এ-বিষয়ে বিশেষ একগুঁয়ে হওয়া দরকার। কর গগন রজনী সাগর প্রভৃতি শব্দকে গদ্যে ঢুকতেই দেবো না। অবশ্য কোনো-কোনো

স্থলে ধ্বনিবিন্যাসের অনিবার্য্যতায় এর ব্যতিক্রম মার্জ্জনীয় হ'তে পারে। আমার নিজের মত, পদ্য রচনাতেও এই প্রতিশব্দগুলি যত বাদ দিয়ে চলা যায়, ততই ভালো। এর উদাহরণ জীবনানন্দর কবিতা। তাঁর গদ্যেও প্রতিশব্দের বর্জ্জন উল্লেখযোগ্য। 'কবিতা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় অজিত দত্তর গদ্য কবিতাটিতে এর ব্যতিক্রম হয়েছে—সেটা ভালো হয়নি।]

৩) সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে বিশেষণ নিতে আপত্তি নেই ; কিন্তু অকারণ বিশেষণ বিশেষরূপে পরিহার্য্য।

[পদ্যরচনায় প্রায়ই দেখা যায় মাঝে-মাঝে বিশেষ কয়েকটি পংক্তি কথা কয়ে' ওঠে, বাকি কথাগুলো ওজন ভরাবার বাজে মাল। গদ্যে প্রতিটি কথাকে কথা কওয়াবার সুযোগ আছে।]

৩

গদ্যই যদি, গদ্যের মত করে' একটানা লিখে গেলেই হয়, পদ্যের মত ছোট-বড় লাইনে সাজাবার কী দরকার? গদ্যের মত করে' কেউ যদি লেখেন আমরা আপত্তি করবো না। তবে চোখের অভ্যাসকে অনেক সময় মানতে হয়। তাছাড়া, গদ্যের ছন্দ অনুসারেই পংক্তি ভাগ করা বোধ হয় বেশি যুক্তিসঙ্গত। পংক্তিগুলো নিজের ছন্দের অনস্বীকার্য্য ঝোঁকেই এক-এক জায়গায় থেমে যায়, সেটাকে স্বীকার করাই ভালো। আর গদ্য কবিতাকেও ষ্ট্যাঞ্জা-অনুসারে ভাগ করা চলে ; তাতে নিয়মিত কি অনিয়মিত মিলেরও ক্ষেত্র আছে : সুতরাং কবিতার মত করে' লেখা হওয়াই দরকার। তবে এমন কবিতা নিশ্চয়ই হ'তে পারে গদ্যের মত করে' লিখলেও যার ক্ষতি হয় না।

গদ্য ছন্দ কি হ্রস্ব লিরিকের উপযোগী, না বর্ণনার ও নাটকীয় কবিতার? এ-প্রশ্নের কোনো মীমাংসা নেই ; বিভিন্ন কবির হাতে বিভিন্নরকম হবে, হ'তে বাধ্য। সমর সেনের ছোট-ছোট লিরিকে হৃদয়াবেগ কাঠিন্যে সংহত ; যেন কবিতার ভাস্কর্য্যরূপ। প্রেমেন্দ্রের 'তামাসা'য় আমরা পেয়েছি মননের কবিতা ; রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ'তে অনেক দীর্ঘ বর্ণনার ও নাটকীয় কবিতা দিয়েছেন ('শাপমোচন' 'শিশুতীর্থ' ইত্যাদি।) নিজস্ব ক্ষেত্রে সার্থক সকলেই। পদ্যে যেমন, তেমনি গদ্যেও সকলরকম কবিতা লেখা হ'তে পারে ; কে কখন কী রকম লিখবেন তা অবশ্য নির্ভর করে প্রতি কবির ক্ষমতা ও তৎকালীন ঝোঁকের উপর।

কোথায় পদ্যের শেষ আর গদ্যের আরম্ভ তার নির্দ্ধারণ বাঙলাভাষায় অন্তত খুবই সহজ। পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল আর পাখিরা ডাকছে, ভোর হ'লো (কি, দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা দ্বিপ্রহর আর দুপুরবেলা, দুয়ারে গাড়ি দাঁড়িয়ে) এ দুটো উক্তি একেবারেই আলাদা জাতের। 'পুনশ্চ'র শেষের দিকে কয়েকটি রচনা আছে—তা গদ্যের মত পড়া যায়, আবার পদ্য করে' পড়াও শক্ত হয় না। এ ধরণের রচনা ঠিক ন্যায়সঙ্গত বলতে পারিনে। গদ্যকে স্পষ্ট সোজাসুজি অব্বিধ গদ্যই হ'তে হবে।

উল্লিখিত নিয়মগুলো মেনে নিয়ে পদ্যে লিখলেই হয়, গদ্যের কী দরকার? পদ্যে লিখলেও আমি ও-নিয়মগুলো যথাসম্ভব মানবো, তবে গদ্যেরও দরকার আছে। কোনো-কোনো কথা যেন গদ্যেই ভালো বলা চলে। গদ্য কবিতার একটা ন্যায়সঙ্গত বাহন, এই কথাটাই শুধু আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই। ভবিষ্যৎ কবিতার ভাষা গদ্যই, কি গদ্য আস্তে-আস্তে

পদ্যকে স্থানচ্যুত করবে, এমন কথা ‘কবিতা’র সম্পাদকরা কখনো মনেও আনেন না, কেননা তাঁরা পদ্যরচনার চর্চা ছেড়ে দেননি, দিতে পারেনও না।

অতি সংক্ষেপে মোটা কথাগুলোই শুধু ছুঁয়ে যাওয়া গেলো। এ-সম্বন্ধে আরো অনেক সূক্ষ্ম আলোচনার দরকার হয়-তো আছে; কিন্তু সে-সব জটিল তর্কের জায়গা ক্ষীণাঙ্গ ‘কবিতা’র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা নয়।

‘কবিতা’ সংক্রান্ত সমস্ত চিঠি-পত্র ১২ যোগেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

‘কবিতা’র প্রতি সংখ্যা নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য :

এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স : ১৫ কলেজ স্কোয়ার,
গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং : ১১ কলেজ স্কোয়ার,
ডি, এম্, লাইব্রেরি : ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট,

কলিকাতার গ্রাহকরা এম্, সি সরকার এণ্ড সন্স-এ ও ‘কবিতা’র বার্ষিক মূল্য জমা দিতে পারেন।

কবিতা

প্রথম বর্ষ   আষাঢ়, ১৩৪৩   চতুর্থ সংখ্যা

চার অধ্যায়

সমর সেন

একটি রাত্রি

আমার চোখে ঘুম নেই,
যখনি ক্লান্ত চোখ বুজি—
চারদিকে ঘেরে দীর্ঘ ছন্দে
সুদীর্ঘ অন্ধকার।
আমার চোখে ঘুম নেই,
স্পন্দমান দিনগুলি আমার দুঃস্বপ্ন।
দিন নেই, রাত নেই, বারে বারে চম্‌কে উঠি—
শুধু মনে পড়ে—
কঠিন অন্ধকারে অবরুদ্ধ বাতাস
দেয়ালের উপরে বিষণ্ণ ছায়া,
আর তোমার পাশে—
রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত আমার দীর্ঘশ্বাস।
রাত নেই, দিন নেই, বারে বারে চম্‌কে উঠি,
আমার মনে শান্তি নেই, আমার চোখে ঘুম নেই,
স্পন্দমান দিনগুলি আমার দুঃস্বপ্ন।

আর একটি রাত্রি

হেমন্তের সোনালি আলো সবুজ ঘাসে।
তারপরে,
ফাঁকা মাঠের নিঃশব্দ, গভীর রাত্রি,
আর নীড়হারা পাখীর শব্দ নিঃসঙ্গ আকাশে।
মাঝরাতের ঘুমের মতো তোমার কালো চুল
আমার মুখের উপরে নাম্‌ল :
সেই চুল, সেই গভীর চোখ, নরম শরীরে
সেই পুরোনো মরুভূমির ব্যাকুলতা ;
আজ কেন জানি রক্তে অনুভব করি,
আকাশের বিস্তীর্ণ মুক্তিস্রোত,
গহন অন্ধকারে দীপ্ত সূর্য্য যখন
হানা ছায় ক্লান্ত রাত্রিকে।

একটি নিউরটিক কবিতা

অন্ধকারের স্তব্ধতা ভেঙে কে যেন বল্‌ল—
"জানো, কাল রাত্রে মিলির বিয়ে হ'য়ে গেছে ?"
—অন্ধকারের দীঘিতে সে শব্দ পাথরের মতো।
"ও কিছুই নয় ; কদিনই বা মনে থাক্‌বে ;
তবে হয়ত কোনোরাত্রে রতিবিহারের সময়
হঠাৎ তোমাকে মনে পড়্‌বে,
আর সেদিন সমস্ত রাত
চোখে আর ঘুম আস্‌বে না।"
অন্ধকারে ওর দাঁত হাসিতে ঝকঝক করে উঠ্‌ল।

কিছুই নয়, শুধু আকাশের মহাশূন্য, ঝরাপাতার কান্না,
আর হাওয়ায়
নামহীন ফুলের অদ্ভুত চাপা গন্ধ
মুহূর্ত্তগুলির নিঃশব্দ কান্নার মতো ;
আর বসন্তের কোনো রাত্রে—
পদ্মদীঘির জলে যখন ছায়া গভীর হবে,
তখন বাসনায় ক্লান্ত দেহ,
কার নিঃসঙ্গ, অদৃশ্য মূর্ত্তি চকিতে আস্‌বে
নিমীলিত চোখের অন্ধকারে,—
আর সে রাত্রে পৃথিবীর সমস্ত ঘুমে দুঃস্বপ্ন।

মুক্তি

তারপরে আমি গেলাম অনেক দূরে,
অনেক দূরের সেই দেশে,
যেখানে রাত্রে স্বপ্ন আসে
সবুজ পাতায় ম্লান পাখীর মতো ;
আর আমি ভাবলাম—
একটি মানুষকে ভুল্‌তে কতোদিনই আর লাগে,
কতোদিনই বা লাগে শরীর থেকে মুছে ফেল্‌তে
আর একজনের শরীর-সর্ব্বস্ব আলিঙ্গন ;
মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস,
স্যাকারিনের মতো মিষ্টি
একটি মেয়ের প্রেম !
এখানে শিগগিরই বসন্ত নাম্‌বে
সবুজ উদ্দাম বসন্ত !
কিন্তু সাইকেলে-ফেরা কেরানির ক্লান্তিতে,
দিনের পর দিন
ঘড়ির কাঁটায় মন্থর মুহূর্ত্তগুলি মরে
মৃত্যু-মুখর রক্তের কান্নায় ;

ডাষ্টবিনের সাম্‌নে
মরে-যাওয়া কুকুরের মুখের যন্ত্রণায়
সময় এখানে কাটে ;
এখানে কি কোনোদিন বসন্ত নাম্‌বে,
সবুজ উদ্দাম বসন্ত !
আর কোনোদিন কি মুছে যাবে
স্যাকারিনের মতো মিষ্টি একটি মেয়ের প্রেম।

—উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন
এপ্রিলের বসন্ত আজ।

ক্লান্তি

সমর সেন

অনেক রাত্রে
গহন অরণ্যের পিছনে চকিতে চাঁদ উঠে এলো,
কুয়াশায় স্তব্ধ, সুদূর, সুকঠিন।
আর হাওয়া দিলো
উত্তরের বহুদূর দিগন্ত থেকে।
রক্তের জোয়ারে ক্লান্তির স্তব্ধতা এলো।—
আজ, আলিঙ্গনের শ্লথ বন্ধনে
কি স্বপ্ন যেন বারে-বারে আসে,
সে-স্বপ্ন দেহের অবরুদ্ধ অন্ধকারে
চকিতে ভিজে ফুলের গন্ধ আনে,
আর আমার ক্লান্ত চোখে ঘুম আসে না।

বিরহ

সমর সেন

রজনীগন্ধার আড়ালে কি যেন কাঁপে,
কি যেন কাঁপে
পাহাড়ের স্তব্ধ গভীরতায়।
তুমি এখনো এলে না।
সন্ধ্যা নেমে এলো : পশ্চিমের করুণ আকাশ,
গন্ধে-ভরা হাওয়া,
আর পাতার মর্ম্মর-ধ্বনি।

উর্ব্বশী

সমর সেন

তুমি কি আস্‌বে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো !
কিম্বা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আস্‌বে,
হে ক্লান্ত উর্ব্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ণমুখে
উর্ব্বর মেয়েরা আসে :
কতো অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি,
কতো দীর্ঘশ্বাস,
কতো সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো,
আর কতো দিন !

শেষ বসন্ত

সমর সেন

ফাঁকা মাঠে রোজ দেখি
বিবর্ণ হলুদ ফুলের বন্যা,
কিসের কালো আভাস রোদে-পোড়া ঘাসের ডগায়,
আর অলস দুপুরে
হাওয়ার ঝলকে শুনি ঝরাপাতার হাহাকার,
আর দিনের পর দিন
ক্লান্ত দিন ক্লান্ত রাত্রিকে প্রদক্ষিণ করে ;
আজো কি বসন্তের যন্ত্রণা কাঁপে
তোমার সমস্ত শরীরে ?
গাছের সবুজ দিগন্তে ছড়িয়ে
বৃষ্টি নেমে এলো,—
আর একদিন নিষ্ঠুর, সুন্দর অন্ধকার নাম্‌বে
রাত্রের ট্রেনের মতো রুদ্ধশ্বাস :
তখনো কি তোমার পৃথিবীতে থাকবে
পায়রার পায়ের মতো লাল, অলস স্বপ্ন ?
বলো,
তখনো কি কাঁপবে বসন্তের যন্ত্রণা
তোমার সমস্ত শরীরে ?

একটি মেয়ে

সমর সেন

আমাদের স্তিমিত চোখের সাম্‌নে
আজ তোমার আবির্ভাব হোলো :
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস ;
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্ব্বল, ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।

স্বপ্ন আসে, স্বপ্ন ভেঙে যায়

বুদ্ধদেব বসু

স্বপ্ন আসে, স্বপ্ন ভেঙে যায়।
কে যেন জড়ায়
কামনারে পাকে-পাকে বুদ্ধির চূড়ায়
প্রবৃত্তিরে পাকে-পাকে প্রজ্ঞার চূড়ায়।
কামনার পাকে-পাকে
কল্পনার বাঁকে-বাঁকে
স্বপ্ন আসে অশান্ত হাওয়ায়
স্বপ্ন নামে চোখের পাতায়।
স্বপ্ন নামে অন্ধকারে রঙিন ছায়ায়।
স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে
জন্ম থেকে জন্মান্তরে
চিরন্তন চংক্রমণ,
অন্তহীন আক্রমণ
স্বর্গের ছায়ায়।

অন্তহীন আক্রমণ,
অন্তহীন নিষ্ক্রমণ
স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে।
জন্ম থেকে জন্মান্তরে
ঘুরে মরি মূঢ়, অন্ধ—কোথা মুক্তি, কোথা ত্রাণ
কোথায় নির্ব্বাণ ?
সে কি বুদ্ধির চূড়ায়
সে কি প্রজ্ঞার চূড়ায়
অথবা কি মৃত্যুর তিমির-চূড়ায় ?
কামনার কুয়াশায়
কল্পনার দুরাশায়
স্বপ্ন আসে
স্বপ্ন আসে অশান্ত আকাশে
স্বপ্ন আসে নির্লজ্জ হাওয়ায়।
তারপর ঘুম ভেঙে যায়।
বার-বার ঘুম ভেঙে যায়
বিকেলবেলায়।

চেয়ে দেখি দেয়ালের গায়
ধূসর ছায়ারা চলে
দলে-দলে,
সারি-সারি
ফ্যাকাশে ছায়ারা সব করে পায়চারি
দেয়ালের গায়
বিকেলবেলায়।
ছায়ার প্রেতের দল ধূসর হাওয়ায়
ভেসে যায়
শূন্যতার সীমানায়।
স্বপ্নের প্রেতের দল ধূসর হাওয়ায়
বোবা ইসারায়
ডাইনির চুলের মত জড়ায়ে-জড়ায়ে
প্রেতের হাতের মত আঙুল বাড়ায়ে
পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠে সর্পিল ধোঁয়ায়
চকিতে হারায়।

আর আসে ঘুম
আসে ঘুম
আসে ঘুম চোখের পাতায়
আসে ঘুম নির্লজ্জ হাওয়ায়
আসে ঘুম অন্ধকারে রঙিন ছায়ায়।
কে যেন জড়ায়
কল্পনারে পাকে-পাকে বুদ্ধির চূড়ায়
কামনারে পাকে-পাকে প্রজ্ঞার চূড়ায়।
স্বপ্ন দোলে
পলে-পলে
মেঘে-মেঘে আঁকাবাঁকা আকাশের তলে;
স্বপ্ন কাঁপে
স্বপ্ন কাঁপে চোখের পাতায়।
ঘন আবছায়ায়
ঝাপসা জ্যোছনায়
আকাঙ্ক্ষায় আঁকাবাঁকা আকাশের তলে
উল্কার মতন জ্বলে
উল্কার মতন চলে
স্বপ্নের মিছিল।

আকাঙ্ক্ষায় নীল
আকাশের তলে
পলে-পলে
স্বপ্ন জ্বলে
স্বপ্ন জ্বলে অন্ধকারে রঙিন ছায়ায়।
কামনার দুরাশায়
কল্পনার কুয়াশায়
স্বপ্নের বীজের ঝড় নির্লজ্জ হাওয়ায়।
স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে
জন্ম থেকে জন্মান্তরে
আমাদের চক্রমণ
অন্তহীন চক্রমণ
মুক্তিহীন চক্রমণ

—তারপর ঘুম ভাঙে বিকেলবেলায়।

এখন বিকেল

বুদ্ধদেব বসু

এখন বিকেল।
চলো যাই, যেইখানে নারিকেল
সুপারির পাতায়-পাতায়
দখিনা হাওয়ার ঢেউ দোলে।
চলো বাইরে যাই।
চলো যাই রাস্তা পার হ'য়ে
ট্র্যাম-লাইন পার হ'য়ে—ঝাঁকে-ঝাঁকে দেয়ালে-দেয়ালে
শকুনের দুরন্ত ডানার মত প্ল্যাকার্ডের দল
ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ন্ত শকুন প্ল্যাকার্ডের দল
ছিঁড়ে কেড়ে নিতে চায়, কেড়ে নিয়ে খেতে চায় চোখ—
আমরা এড়ায়ে যাবো : যাবো যেইখানে
সুপারির সরু-সরু ছায়া চলে
সরু-সরু সাপের মতন এঁকেবেঁকে
দক্ষিণের হাওয়ার তাড়ায়।

আমাদের এ-পাড়ায়
শান্তি নেই, চারদিকে গ্রামোফোন। আমাদের এই ঘরে
আলো নেই, চলো বাইরে যাই।
কড়া ইলেকট্রিক আলো কাঁচা চর্বির মত সাদা
এখনি জ্বালতে হবে। চায়ের চামচে
বাজবে তোমার
হাতের চুড়ির তালে-তালে। পাশের ফ্ল্যাটের
উনুনের ধোঁয়া এসে নিমেষে নিঃশ্বাস
কেড়ে নেবে—অতি-উন্নাসিক সমালোচনার মত।
তবু—তবু এখনো বিকেল
বাইরে বিকেল।
এখনো বিকেল আসে চুপে-চুপে কলকাতায়
এখনো কোকিল ডাকে হঠাৎ-ব্যথার মত
দক্ষিণে হাওয়ায়।
আমরা আজ দুঃসাহসী সমুদ্র-দস্যুর মত
চলো লুঠ করে' আনি বিকেলের রূপকথা-দ্বীপেরে।
কী সুন্দর তুমি! তোমার শরীর যেন পাল-তোলা নৌকার মাস্তুল,
ছল্‌ছল্‌ জলের ঢেউয়ের মত চুল।

চলো চলো ! রূপালি সাড়ির
আঁচল উড়ায়ে দাও ফুলে-ওঠা পালের মতন
দক্ষিণে হাওয়ায়।
চলো যাই, যেইখানে নারিকেল
স্থপারির জড়িত ডালের
ছায়ার জালের
ফাঁকে-ফাঁকে আলোর সোনালি গুঁড়ো
সোনালি বৃষ্টির মত ঝরে
মাঠের উপরে।
হঠাৎ-ব্যথার মত যেথানে কোকিল
চুপচাপ আকাশেরে ছিঁড়ে দিয়ে যায়
দক্ষিণে হাওয়ায়।
সেথানে সোনালি আলো বৃষ্টির মতন ঝরে
মুখের উপরে। জলের মতন ঝরে
তোমার আমার মন ; স্রোতের মতন পরস্পরে
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ঝলকে-ঝলকে মিশে যায়
তোমার আমার মন।

এইখানে আঁকাবাঁকা ছায়ার বুনোন
ভরে' দিলো মন।
চেয়ে দ্যাখো, স্মৃতির জানালা খোলা।
চেয়ে দ্যাখো, কত মেঘ মোমের মতন জলে' গেলো
মোমের মতন গলে' গেলো
পশ্চিমের লালে।
দিগন্তের আম-জাম-নিম
যেথানে নিবিড় নীল, সেথানে পশ্চিম
লাল হ'লো
লাল মশালের মত।
লাল মশালের মত উদ্দাম রঙিন
জলন্ত পশ্চিম।
চেয়ে দ্যাখো, দিগন্তের নিবিড় স্থবির নীল
হঠাৎ উদ্দাম হ'লো রঙিন ছায়ায়।
ঝলোমলো ঝলোমলো
পশ্চিম চঞ্চল হ'লো,
হৃদয় চঞ্চল হ'লো
তোমার আমার।

চেয়ে দ্যাখো হলদে পাতার দল ঘুরে-ঘুরে
কানে-কানে এলোমেলো কথা কয় :
এলোমেলো এলোমেলো
হৃদয়ে বসন্ত এলো
তোমার আমার।
এখন বিকেল, চলো যাই
চলো যেইখানে নারিকেল
স্থপারির পাতায়-পাতায়
দক্ষিণে হাওয়ার দোলা।
চেয়ে দ্যাখো, স্মৃতির জানালা খোলা,
চলো যাই। আর
আর-একটু কাছে এসো, হাত রাখো হাতে।
কানে-কানে কথা কই হলদে পাতার মত
হলদে পাতার মত ঘুরে-ঘুরে দক্ষিণে হাওয়ায়।
হয়-তো উঠবে চাঁদ
উঠবে হলদে চাঁদ
মাথার উপরে
আর-একটু পরে।

হলদে পাতার মত একমুঠো চাঁদ
হালকা পরীর মত উড়ে চলে' যায়
দক্ষিণে হাওয়ায়।
হয়-তো উঠবে চাঁদ
হয়-তো উঠবে চাঁদ মাথার উপরে,
হয়-তো ফুটবে চাঁদ বুকের ভিতরে
তোমার আমার।
এসো, আর-একটু কাছে এসো, আর
রক্তের নদীতে শোনো চাঁদের জোয়ার।
আঁটোসাটো ছোটো ফ্ল্যাটে আমাদের বাসা,
ঘরে বসে' পাশের বাড়ির গ্রামোফোন;
ঝাঁকে-ঝাঁকে প্ল্যাকার্ডের শকুনের পাখা
আমাদের দিনের মুখেরে ঢেকে দেয়।
আমাদের দিনগুলো গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে ভেঙে যায়
ট্র্যাফিকের চাকায়-চাকায়।
তবু—তবু এখন বিকেল।
এখনো বিকেল আসে চুপি-চুপি কলকাতায়
হঠাৎ-ব্যথার মত এখনো কোকিল ডাকে
দক্ষিণে হাওয়ায়।

এখনো কলকাতার আকাশের সিঁড়ি ভেঙে
চুপি-চুপি উঠে আসে চাঁদ।
এখনো রক্তের স্রোতে চাঁদের জোয়ার।
এখন বিকেল
ঝলোমলো জলিছে পশ্চিম
চলো, চলো।
এলোমেলো দক্ষিণে হাওয়ায়
স্মৃতির জানালা খোলো, চলো
চলো।
হয়-তো উঠবে চাঁদ মাথার উপরে
আর-একটু পরে।

শঙ্খমালা

জীবনানন্দ দাশ

কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,
বলিল, তোমারে চাই : বেতের ফলের মত নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি,—কুয়াশার পাখ্‌নায়,—
সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক
জোনাকীর দেহ হতে,—খুঁজেছি তোমারে সেইখানে ;—
ধূসর পেঁচার মত ডানা মেলে অঘ্রাণের অন্ধকারে
ধানসিড়ি বেয়ে বেয়ে
সোনার সিড়ির মত ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জ্জন পেঁচার মত প্রাণে।

দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই:পাখি দেয় ধরা ;—
বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর।

কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম,
চোখে তার হিজল-কাঠের রক্তিম
চিতা জলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়।.

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার!
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মত,—দুধে আর্দ্র,—কবেকার শঙ্খিনীমালার!
এ পৃথিবী একবার পায় তারে—পায় নাক' আর।

বুনো হাঁস

জীবনানন্দ দাশ

পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে,—
জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে

বুনো হাঁস পাখা মেলে;—শাঁই শাঁই শব্দ শুনি তার;
এক—দুই—তিন—চার—অজস্র—অপার—

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মত শব্দে; ···ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তারা।

তারপর পড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ,—দু একটা কল্পনার হাঁস;

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অশ্রুকণা সান্যালের মুখ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক

কল্পনার হাঁস সব;—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

প্রতীক

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মিলের ধোঁওয়ায় ঢাকা শরতের নীল নভস্তল ;
নগরের আবর্জ্জনা জাহ্নবীর পুণ্য স্রোতে ঘুরে ;
ছুটি-পাওয়া মসিজীবী দল বেঁধে করে কোলাহল ;
পরিক্ষিপ্ত পরচর্চ্চা বিষায়িছে বিমুক্ত বায়ুরে ॥

তুমি আর আমি দোঁহে ব'সে আছি ষ্টীমারের কোণে,
অপ্রতিভ, অপাংক্তেয়, অনাহূত অতিথির মতো।
জানি না, কি ভাব জাগে তব মৌন চিত্তের গহনে,
ভিড়ের সংসর্গ মোরে করে সদা নৈঃসঙ্গ্যবিব্রত ॥

তাই ধায় স্মৃতি মোর অতীতের নিরিন্দ্রিয় লোকে,
ছায়াতরী-বিমন্থিত মরুমুখী প্রেতনদীপানে,
নির্ব্বাক বৈদেহী এক মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের আলোকে
সাযুজ্যের মূলমন্ত্রে দীক্ষা দিলো আমারে যেখানে ॥

সে-নিগম সাধনায় হয়তো বা ঘটেছিলো ত্রুটি ;
মিলে নাই মোক্ষ, শুধু ছিঁড়ে গেছে জীবনের ডোর।
সেই থেকে বেঁচে আছি মরণের গৈবী পায়ে লুটি ;
আমারে ডরায় লোকে, জনসংঘ বিভীষিকা মোর ॥

তবু বিশ্বমানবেরে একমাত্র সত্য ব'লে জানি ;
অতিমর্ত্ত্য তারি স্বপ্ন, বিধাতা যে কল্পপুত্র তার।
সভ্যতার রক্তলিপ্সা হ'য়ে গেছে আজ কানাকানি ;
আদর্শের দৈববাণী প্রতিধ্বনি প্রবৃত্তি-গুহার ॥

তাই মানুষের দিকে বারম্বার মেলে দেই হাত,
আবশ্যিক বিসংবাদে বারম্বার হই পণ্ডশ্রম।
জানি নেই অন্য গতি, তথাপি সে-আহ্নিক আঘাত
সঞ্চারে উৎসাহে দ্বিধা, নিরুৎসুক হয় উপক্রম ॥

কিন্তু কেন নাহি জানি, এ-কুৎসিত বৈরী প্রতিবেশে
তোমার সান্নিধ্যে ব'সে নির্ব্যক্তিক আলাপের মাঝে,
অকস্মাৎ মনে হয়, পৌত্তলিক রিক্ত নিরুদ্দেশে
আমার অজ্ঞাতবাস ফুরাইলো আজিকার সাঁঝে ॥

অথচ বলিনি কিছু, বলিবার কিছুই যে নাই ;
নাটকীয় মর্ম্মবাণী করি নাই মোরা বিনিময় ;
আকর্ষি কালের ব্যঙ্গ জানাইনি পণের বড়াই ;
নয়নে নয়নে চাহি চারিচক্ষে জাগেনি বিস্ময় ॥

হয়তো বা তাই তুমি বহিরঙ্গ দৈন্য মম দেখে
অস্বীকার করিবে না মোর গুপ্ত মৌল আমিটিরে,
চিনিবে সে-চিরঞ্জীবে মরণের অন্তরালে থেকে
যে নমিবে জন্মক্রমে যুগে যুগে নিত্য পৃথিবীরে ॥

চিনিবে সে-আশুতোষে, এইমতো তূর্ণ সন্ধিক্ষণ
যার কাছে শ্রেয়স্কর আত্মনিষ্ঠ অনন্তের চেয়ে ;
ধন্য হয়ে যায় যার অফুরন্ত বিচ্ছিন্ন জীবন
বিরল অমৃতযোগে সদ্ভাবের প্রতিভাস পেয়ে ॥

সম্ভবত এও ভ্রান্তি, মায়াময় তুমিও বুঝি বা ;
হয়তো যাহারে দেখো, সেও নয় ছায়ার অধিক।
তবু, যদি সত্য হও, মনে রেখো আজিকার দিবা
তোমারে করিলো, দেবী, অন্তর্যামী প্রাণের প্রতীক ॥

আলো

স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

তোমার ওই কোণের ঘরটিতে রাত্রে আলো জল্‌ত,
জানালা দিয়ে সে আলো আস্‌ত আমার ঘরে,
পর্দ্দার উপরে মাঝে মাঝে পড়ত ক্ষণিক ছায়া,
শুনেছিলেম তুমি অধ্যবসায়ী ছাত্র।

নিশুতি রাতে হঠাৎ যেদিন ঘুম ভেঙে যেত,
দেখ্‌তে পেতেম তোমার সেই আলো,
যে আলো প্রতি সন্ধ্যায় জলে উঠ্‌ত,
শীতে গ্রীষ্মে, পূর্ণিমায় অমাবস্যায়।

হঠাৎ একদিন দেখি তোমার ঘরে আলো নেই।
দিনের পর দিন যায়, সে আলো আর জলে না।
জানিনা কেন আমার মন কেমন করে,
কেউ ত কিছু বলে না, জিগ্‌গেস কর্‌তে লজ্জা হয়।

সূর্য্যোদয়

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

রজনী তখন প্রভাতকল্পা
কৃষ্ণাবগুণ্ঠন আধ উন্মোচিত হয়ে এল,
তারই অন্তরালে দেখা গেল
নিদ্রাজড়ানো স্বপ্নময় আঁখির নিবিড় আবেদন।

আকাশের তারা স্তিমিত, কৃষ্ণাএকাদশীর
বিশীর্ণ চাঁদ মধ্যপথে মন্থর।
গিরিসানুভূমিতে কুয়াসা জড়িয়ে আছে
স্বাদহীন নির্লিপ্ত নির্ভরতায়।

আমি দেখচি, ভোর হল এই দূর দেশে
লাল মাটি আর শাল মহুয়ার দেশে।
পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের অপর্য্যাপ্ত স্তব্ধতা
ভোরের অলস বায়ুস্পর্শে দেহ স্নিগ্ধ।

একটা পুরোনো ছবি দেখলুম নূতন করে
যে ছবি দেখিনি বহুদিন। অবচেতন ছিলেম
বিংশ শতাব্দীর ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌মের দুর্য্যোগে
আর সমরোত্তর ইকনমিক্‌সের গাঢ় মদে।

আমার মগ্নচৈতন্যের প্রকাশ্যরূপ আজ
দেখ্‌তে পেলেম এইখানে এই দূর দেশে।
ভাবচি মনে-মনে কোথায় ছিল এ আলো
তারি স্পর্শে শিউরে উঠ্‌চে আমার মন।

হঠাৎ চম্‌কে চেয়ে দেখি পূব গিরিশিখরে,
যেন স্বর্ণকারের গলানো সোনা কে ফেলেচে উল্‌টে
সে সোনার জল লেগেছে অরণ্যের শিরে
ঝল্‌মলিয়ে উঠ্‌চে আমলকীর চূড়া।

আগুনের শিখা ছড়িয়ে গেল দিগন্তরে
সে মহোৎসবে যোগ দিয়েচে লাল মাটি।
রক্তরাঙা পলাশের অপরিমেয় দাক্ষিণ্য
রিক্তপত্র অশোকমঞ্জরীর উচ্ছৃঙ্খলতা।

এ দীপ্তিতে রাঙিয়ে উঠ্‌লো আমার চিত্ত
এই দূরদেশে দেখলুম আজ নব সূর্য্যোদয়।

মৃত্যু, প্রেম ও মহাকাল

বিষ্ণু দে

১

স্বপ্ন আমার কবিতা।
অমাবস্যার দেয়ালি।
শোকাবসন্ন নিদ্রাহীন
মাঘরজনীর সবিতা।

২

হৃদয় আমার খেয়ার যাত্রী বৈতরণীর পার।
কাণ্ডারীহীন বালুকাবেলায় দৃষ্টি ঘুরিছে দূরে।
হৃদয়ে আমার ডুবাল গো প্রায় বাতাসের হাহাকার।

দিনগুলি মোর তুলে' নিলে অঞ্চলে।
বালুচরচারী দৃষ্টিতে ঝরে সান্নিধ্যের ধারা।
রাত্রিও চাও?
শ্রাবণের ধারাজলে
তালীবনদীঘি হৃদয় মুখর কল্লোলে অবিরাম।

ক্রেসিডা ! তোমার থমকানো চোখে চমকিছে বরাভয়।
আশ্লেষে তব অন্তবিহীন ক্রতোক্তুতের শেষ।
তোমাতেই করি মত্তমরণে জয়।

৩

মহাকাল আজ প্রসারিল কর মোর দক্ষিণ করে।
ভীরু দুর্ব্বল মন !
দৈবের হাতে হাত বেঁধে যাওয়া মরণের পরপারে।
সর্ব্বসমর্পণ।

৪

হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঙ্কার করতাল।
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী।
রজনীগন্ধা দলিত আমার কাল রজনীর ঝড়ে।

বৈশাখী মেঘ মেদুর হয়েছে সুদূর গগনকোণে।
কুরুক্ষেত্রে উড়িছে হাজার রথচক্রের ধূলি।
স্বপ্নগোধূলি ডুবে গেল খর রক্তের কোলাহলে।

৫

ধোঁয়ামেঘে ঠেলে নীলমেঘ, নীলে কালো মেঘেদের ভিড়।
মেঘে মেঘে আজ ভিজা শ্রাবণের দিন হল একাকার।
বিদ্যুৎ নেভে পুরবীহাওয়াতে, বজ্রও দিল ডুব।
এলোমেলো পাখা ঝাপটি তবুও কথাগুলি ওড়ে তার।

ভ্রান্তি তোমার নিয়ে যায় যদি বৈতরণীর পার,
আঁধার ক্লান্তি কাকে দেবে উপহার ?
তপ্ত মরুর জনহীনতায় কোথায় সে প্যাণ্ডার ?

৬

সূর্য্যালোকের ধারায় জেগেছে জীবনের অঙ্কুর।
আত্মদানের উৎসেই জানি উজ্জীবনের আশা।
অসূর্য্যলোকে বন্দী, কুমারী ! তোমাতেই খুঁজি ভাষা।

সময়ের থলি শতেকছিদ্র, বিস্মৃতিকীট কাটে।
প্রাণোপসনার পূজারী তাই ত তোমার শরণ মাগি।
প্রাণহন্তারা রলরোলে চলে ট্রয়ের মাঠে ও ঘাটে।

ধূসর আকাশে উষর হয়েছে মরণের আনাগোনা।
হেলেনের বুকে শবসাধনার বিশ্রাম আর নেই।
আমার হৃদয়-ঘটাকাশে শুধু জীবনের আরাধনা।

৭

জানি, জানি এই অলাতচক্রে চক্রমণ।
কূটসোল্লুটে বলি নাক তাই কথা।
ক্রেসিডা, আমার প্রচণ্ড আকুলতা
জীবনের লোভে বিদিশা বিভ্রমণ।

৮

ট্রয়ের প্রাচীর ভঙ্গুর কেন ? কোন্ হেলেনের
অমর রূপের প্রখর আবেগে বিপুল বিশ্ব হারাল দিশা ?
লোকোত্তর এ রূপসী কেন বা লোকায়ত এই মরণ-তৃষা ?

৯

সোনালি হাসির ঝরণা তোমার ওষ্ঠাধরে।
প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে এনেছে চপল মায়া।
মুখর সে গান ছিঁড়ে গেল আজ স্তব্ধ তমাল।
হাল্কাহাসির জীবনে কি এল ফসলের কাল ?

এই তবে ভোরবেলা !
হে ভূমিশায়িনী শিউলি আমার
কোনো সান্ত্বনা নেই ?

রজনীগন্ধা দিয়েছিলে সেই রাতে।
আজো তারা ফোটে দেখি
মদির অধীর রাতের শান্ত ফুল—
রজনীগন্ধা সে জানে না বুঝি রাগ।

১০

কালের বিরাট অট্টহাসির ছায়া
ঢেকে দিল ঢেকে তোমারও মরণমায়া।
হে মাতরিশ্বা, মহাশূন্যের স্বখে
তুড়ি দিয়ে যাই তোমারও প্রবল মুখে।

দুঃস্বপ্নেও প্রেম করে নি এ আশা।
শত্রুশিবিরে কটীর নীবির চোখের মুখের
তন্বীতনুর এই বিবস্ত্র ভাষা।

হে গ্রীকনাগর, ট্রয়কে হারালে আজই।

তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে' দেবে ?
উদ্বায়ু আজো হয় নি ক মোর মন।
লোকায়ত মোর স্বেচ্ছাবর্মে লেগে
বর্শা তোমার হয়ে' গেল খান্ খান্।

অপাপবিদ্ধ বুদ্ধি আমার অস্থাবির।
জড় কবন্ধ অন্ধ কর্ম্মে ফুৎকার মোর নর্ম্মাচার।
প্রাক্তন পাশ্চাত্য মাগি না। মন তুষার।

১১

পাহাড়ের নীল একাকার হল ধূসর মেঘের স্রোতে
পাঁচপাহাড়ের নীল।
বাতাসেরা সব বাসায় পালাল মেঘের মুষ্টি হতে।
স্তব্ধ নিথর পাঁচসায়রের বিল।

১২

তুমি চলে' গেলে মরণ-মারীচ মায়াবীর ডাকে মূকবধির ওষ্ঠাধরে।
তারপরে এল রণমন্থনে দূরবিদেশের নারী।
কালো সন্ধ্যায় দিল শ্বেত বাহু দুটি
—স্মরণ তোমার নামে আজো তরবারি।

মহামায়া ও পৃথিবী

হেমচন্দ্র বাগচী

তুমি যা'কে মহামায়া ব'লে জান্‌লে
তা'র মায়াকে জয় কর্‌বে কি ক'রে ?
ঋতুতে ঋতুতে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে
প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত্তে তা'র নিঃশব্দ আহ্বান তুমি শুন্‌তে পাও না কি ?
সে যে তোমার মা।

তোমার মা'র সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ ঘটেছিল
—সে বিচ্ছেদ যেন নাড়ীছেদনের বেদনার মত।

সেই মা'কে তুমি আবার পেয়েছ—
আশ্বিনের শিউলিফুলের সৌরভে।
ঝিল্লীর ঝঙ্কারে, অসংখ্য প্রাণীর বিচিত্র কোলাহলে,
এই অতিবৃহৎ পৃথিবীর বিচিত্র অনুরণনে
তোমার মা তোমাকে আবার দেখা দিয়েছেন।

মনে হয়, আকাশ যেন নীল চাঁদোয়া
সূর্য্য যেন সূর্য্য নয়—সে একটা আলোর ঝালর।

কবিতা

স্বন্দর নীলরাত্রিতে যে চাঁদ ওঠে,
মনে হয়, সে যেন আর কারো দৃষ্টি
স্নিগ্ধ, স্থির সে চাহনি,
কত জন্ম, কত জন্মান্তরের পার থেকে সে তোমার
দিকে চেয়ে আছে।

কিপলিঙ ও হাউসম্যান

কোনো-কোনো কবি আসেন যেন :তাঁর দেশের কাব্যস্রোতের মোড় ফেরাতে। আড়ালে থাকে অনেক সামাজিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সেগুলো দেশের লোকের মনে সাধারণভাবে ছড়িয়ে থাকে—কবি হঠাৎ তার স্বর খুঁজে পান। যে-দু'জন ইংরেজ কবির সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে, তাঁরা দু'জনেই এই শ্রেণীর, যদিও আর কোনো বিষয়েই তাদের মিল নেই। কিপ্‌লিঙ ও এ, ই, হাউস্‌ম্যানেই বিংশ শতাব্দীর ইংরেজি কবিতার স্বত্রপাত, এ-কথাটা এতদিনে পুরোনো হ'য়ে গেছে। উভয়েরই আবির্ভাব উনবিংশ শতকের শেষের দিকে। সে-সময়ে ইংরেজি কবিতা স্বইন্‌বর্নের অনুকরণে গড়াগড়ি যাচ্ছিলো; হঠাৎ কিপলিঙের কণ্ঠে বাজলো নতুন স্বর, অন্যদিকে কবিতার এক অপূর্ব্ব পথ খুলে দিলে 'এ শ্রপ্‌শায়ার ল্যাড' নামক অতি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। 'লাস্‌ট্‌ পোয়েম্‌স্‌' নামক ঐ রকম আকারেরই দ্বিতীয় কাব্য এবং কবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ—হাউস্‌ম্যানের সমগ্র রচনা এর বেশি নয়। তবু তিনি ইংলণ্ডের একজন প্রধান কবি ব'লেই বিবেচিত হবেন; এত অল্প লিখে এত গভীর ও ব্যাপক প্রভাব দুর্লভ প্রতিভার পরিচয়। তাঁর জীবনদর্শন—জীবনের সর্ব্বশেষ অনিত্যতা ও অর্থহীনতা সম্বন্ধে গভীর বেদনাবোধ—এটা বিংশ শতাব্দীর অনেক প্রসিদ্ধ কবিরই বিশেষত্ব। এদিকে কিপলিঙের দুঃসাহস, তাঁর কল্লোলিত ছন্দের বেগবান ধ্বনি আর তাঁর পৌরুষের শক্তিও প্রবলভাবেই সংক্রামিত হয়েছে পরবর্ত্তী ইংরেজি কবিতায়। এটা পরবর্ত্তীদের প্রতি অসম্মানসূচক নয়: কথাটা এই যে বিশেষভাবেই যেটা এটা বিংশ শতাব্দীর বাণী সেটা প্রথম ফুটেছিলো এই দুই কবির রচনায়। প্রকৃতিকে মানুষ জয় করেছে, তারই তীব্র আনন্দ কিপলিঙের কবিতায়, ইংরেজের সাম্রাজ্য-স্থাপনের কথাটা তারই একটা অংশমাত্র। অন্যপক্ষে, প্রকৃতির উপর এতদূর জয়ী হ'য়েও মানুষ মৃত্যু, ক্ষয় ও পরিবর্ত্তনের দাস, এত ক'রেও যে মানুষ স্বখী হ'লো না, বরঞ্চ তার সমস্যা আরো জটিল হ'য়ে উঠলো, এরই ব্যথা হাউসম্যানের অতি সরল অতি ক্ষুদ্র রচনাগুলির মূলে। দুটোই এ-যুগের কথা। এখন মনে হচ্ছে কিপলিঙের উদ্দাম ফুর্ত্তিটা অনেকটা নেশার মতো, তার ঝোঁক কেটে এসেছে এরই মধ্যে। কিন্তু হাউসম্যানের প্রশান্ত বিষণ্নতা দিন-দিনই আরো গভীর হ'য়ে বাজবে মানুষের মনে, কেননা ক্রমশই তার জীবন আরো বেশি জটিল হ'য়ে উঠবে, নানা বিচিত্র সমস্যার আন্দোলনে আরো স্পষ্ট হবে তার মৌল ব্যর্থতা।

কবিতার পাঠক

সাহিত্যের সকল রূপের মধ্যে কবিতাই পাঠকের কাছ থেকে সব চেয়ে বেশি দাবি করে। কবিতা বলে অল্প, ধরে' নিতে হয় অনেকখানি। অনেক সময় কবিতার কথাগুলো নির্দ্দিষ্ট কোনো খবরই দেয় না; কিম্বা যে-খবরটা দেয় সেটা আপাতত তুচ্ছ। কিন্তু সেই কয়েকটি কথার পারস্পরিক সংযোজনাই হয় এমন যে মোটের উপর ফলটা হয় অলৌকিক; মনে হয় এমন একটা-কিছু বলা হ'লো যা চিরকালের। যেমন ধরা যাক্ :

ওপারেতে বৃষ্টি এলো, ঝাপসা গাছপালা

আমার কাছে এ-পংক্তিটি অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতা। কিন্তু এতে যে-খবরটা দেয়া হয়েছে সেটা নিতান্তই সাধারণ, এর মধ্যে কোনোই মহান ভাব নেই, জীবন সম্বন্ধে গভীর কোনো মন্তব্য নেই। এমনিতে দেখতে গেলে কথাগুলোর অর্থ বিশেষ কিছুই নয়। তবু এই ক'টি কথা ঠিক এইভাবে সাজানো হয়েছে বলে' তারা অনেক-কিছুই বলে, অপরূপ কিছু বলে। ভেবে দেখতে গেলে মনে হবে, কথাগুলো ভাষার গণ্ডী ছাড়িয়ে গেছে, হ'য়ে উঠেছে কতগুলো ধ্বনিময় রূপক-চিহ্ন। যেন পর-পর কতগুলো নুড়ি বসানো হ'লো, তার উপর দিয়ে পার হ'য়ে

আমরা চলে' এলাম কল্পনার চিরন্তনতায়। এই ধরণের পংক্তি আমাদের কল্পনাকে মুক্ত করে, আর-কিছুই করে না।

কবি অল্প একটু আভাস দিলেন, বাকি অনেকটা আমরা ধরে' নিলাম; এই যোগাযোগে হ'লো কবিতার সার্থকতা। কিন্তু এই যোগাযোগ কি সকল সময়েই হয়? না যদি হয়, দোষ দেবো কার? কবির, না পাঠকের? বিশেষ একশ্রেণীর পাঠকের জন্যেই কবিতা, এ-কথা বলা কি অসঙ্গত? না কি কবিতার পাঠক 'তৈরি' করা যায়?

আমি অনেকদিন অবাক হয়েছি এই ভেবে যে কবিতা থেকে আমি যে-রকম গভীর আনন্দ পাই, অন্য অনেকেই তো সে-রকম পায় না। এবং তারা যে অবশ্যতই অশিক্ষিত বা স্থূলচিত্ত তা কখনোই নয়। এমন লোক তো আশে-পাশে আমরা কতই দেখতে পাই যাঁরা সত্যি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও রুচিসম্পন্ন, কিন্তু কবিতা তাঁরা পড়তে চান না কি পড়েন না কি পড়লেও তা থেকে বিশেষ-কিছু গ্রহণ করতে পারেন না। অথচ সুশিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ কাব্যরসগ্রহণ এ-রকম একটা সংস্কার নিশ্চয়ই কোনোখানে আছে, নয় তো বিদ্যালয়গুলিতে কাব্যপাঠ আবশ্যিক হ'তো না।

বিদ্যালয়গুলিতে যা-ই হোক্, প্রকৃত কাব্যসম্ভোগ—অন্তত উচ্চতম কবিতার সম্ভোগ—বিশেষ একশ্রেণীর পাঠকের জন্যেই। পৃথিবীতে ভালো

কবির সংখ্যা অল্প, ভালো পাঠকের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। এ-পর্য্যন্ত, অন্তত, কবিতার ইতিহাস এই রকমই সাক্ষ্য দেয়। একটা কথা আছে, কবি হ'য়ে জন্মাতে হয়; কবিতার পাঠক হ'য়েও জন্মাতেই হয় হয়-তো। এটা মনের একটা বিশেষ বৃত্তি: যার থাকে না, তার থাকে না। যেমন অনেকে বর্ণান্ধ হ'য়ে জন্মায়, তেমনি অনেকে জন্মায় কবিতা-বধির হ'য়ে—দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যা ঢের ঢের বেশি। কবি বার-বার আমাদের কল্পনাকেই স্পর্শ করেন, তাই খানিকটা কল্পনাশক্তি থাকতেই হবে পাঠকের। তারপর শিক্ষা, চর্চ্চা ও সংস্কৃতির ফলে কবিতা উপভোগের ক্ষমতা ক্রমশই ব্যাপক ও গভীর করে' তোলা যায়, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

এটুকু বলে'ই যদি খালাস হ'তো তাহ'লে ভাবনা ছিলো না। কিন্তু আরো বোধ হয় কথা আছে। সে-কথাটা এই যে সমস্ত মানুষের মনেই কবিতা-প্রীতি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান—এবং সেটা আদৌ শিক্ষা কি বুদ্ধিসাপেক্ষ নয়—তার অনেক প্রমাণ আমরা পেতে পারি। কবিতা না-বলে' ছন্দ বলা ভালো। নির্দ্দিষ্ট ফাঁক দিয়ে-দিয়ে একই রকমের শব্দের পুনরাবৃত্তি নিতান্তই যদি ঢাকের বাজনা না হয় তাহ'লে আমাদের মন তাতে সাড়া দেবেই। এটা মানুষের মধ্যে এমনি মজ্জাগত যে একটা প্রবৃত্তি বললেও দোষ হয় না। ঐরকমের শব্দ শুনতে আমরা

ভালোবাসি; তাতে শ্রম লাঘব হয়, মনে শান্তি আসে, এবং মনের সুখদুঃখ প্রভৃতি প্রকাশ করতে চাইলে ঐরকম শব্দ দ্বারাই যেন সব চেয়ে ভালো হয়। শিশু গুন্‌গুন্ গান না-শুনলে ঘুমোবে না, বৃষ্টি পড়লেই ছোটো ছেলে চেঁচিয়ে ছড়া আওড়াবে, মাঝি নৌকো বাইতে-বাইতে গান করবেই, সুর করে' চীৎকার না-করলে কোনো ভারি জিনিস ঠেলাই যাবে না। এই সুর-করে'-বলা কথার অতি আশ্চর্য্য ও বিচিত্র ক্ষমতা, এবং জীবনের সকল উপলক্ষ্যেই এর ব্যবহার আছে, এটা মানুষের বহু পুরোনো আবিষ্কার। যুদ্ধে কি বিবাহে, কাজে কি উৎসবে এই সুর না-হ'লে মানুষের কখনো চলেনি। তাই সকল দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেই এত বিচিত্র ছড়া-গানের ছড়াছড়ি। অসভ্যদের আর-কিছুই নেই; কিন্তু এই সুর করে' চ্যাঁচানা তাদেরও আছে।

তত্ত্ববিদ বলেন, এখানেই মানুষের কবিতার উৎস। এখান থেকে সুরু করে' কল্পলোকের দুরূহ চূড়া পর্য্যন্ত উঠেছে মানুষের কবিতা। এই ছন্দটা হচ্ছে আদিম ও প্রাথমিক ব্যাপার, এর প্রভাব সকল মানুষের উপরেই সমান। এক হাজার সৈন্য তালে-তালে পা ফেলে চলে' গেলে আমার মন যেমন নেচে উঠবে, ঠিক তেমনি নাচবে একটি শিশুর কি একটি চাষার মন। এখান থেকে আমাদের সকলেরই যাত্রারম্ভ। এখন কে কতদূর পৌঁছতে পারবো সেটাই দ্রষ্টব্য।

শিশুকালে আমাদের প্রায় সকলের কানেই ছন্দ-মিলের ঝমঝমানি ভালো লাগে। তার মানেই এ নয় যে বড়ো হ'য়ে আমরা সবাই কাব্যরসিক হবো। আমরা সকলেই হয়-তো এক ধরণের শিক্ষা পেয়েছি, সকলেই আমরা বুদ্ধিমান ও রুচিসম্পন্ন, বয়ঃক্রমের সঙ্গে-সঙ্গে মনের যথাযোগ্য পরিণতি হ'লো সকলেরই—কিন্তু কবিতা ভালোবাসার বৃত্তি সকলের সমান বিকশিত হ'তে দেখা গেলো না। যদি দশজনকে নেয়া যায়, তার মধ্যে হয়-তো মাত্র একজন রবীন্দ্রনাথের মর্মে প্রবেশ করতে পারলো, চারজন পৌঁছলো সত্যেন্দ্র দত্ত পর্য্যন্ত, আর বাকি পাঁচজন হ'লো হয় কবিতা সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন, নয় এমন সব 'কবি'র ভক্ত যাঁদের নাম এখানে উল্লেখ না-করাই ভালো মনে করলুম (সুবিধের জন্য এখানে ধরে' নিচ্ছি যে কোন্ কবি ভালো আর কোন্ কবি কম ভালো সে-বিষয়ে আমার পাঠকরা আমার সঙ্গে মোটামুটি একমত।)

উপরকার উক্তিটা যে নেহাৎই আনুমানিক নয়, একটু এদিক-ওদিক তাকালেই আমরা তা বুঝতে পারবো। কবিতা যত অল্প লোক পড়ে বলে' প্রথম দৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে আসলে বোধ হয় তা নয়। কবিতা পড়ে অনেকেই, তবে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা পড়ে। এ-কথা বলতে আমার একটুও কুণ্ঠা নেই যে বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথের কবিতা খুব বেশি পঠিত হয় না—'কথা ও কাহিনী' বাদ

দিয়ে। (এবং 'কথা ও কাহিনী'ও যে ছড়িয়েছে তার কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপা, বিখ্যাত অভিনেতাদের আবৃত্তি এবং ও-রচনাগুলির আবৃত্তিযোগ্যতা)। সত্যেন্দ্র দত্ত ও নজরুল ইসলামের প্রচার অনেক বেশি। এমন কি, সাধারণ মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় যে-সব মিলের টুংটাং বেরোয়, তার পাঠকের সংখ্যাও নেহাৎ অল্প নয়। এর বেশির ভাগই হয়-তো কবিতা নয়, কিন্তু গল্পও তো নয়, অন্তত কবিতার মতো দেখতে। 'কবিতা' পড়বার ঝোঁক অনেক লোকের মধ্যেই আছে। তবে এমন কেন হয় যে সকলেই রবীন্দ্রনাথ পড়তে ভালোবাসে না? অধিকাংশের আকর্ষণই কেন নিকৃষ্টের দিকে? এর সব চেয়ে সোজা উত্তর অবশ্য এই যে, স্বভাবতই সকলের মধ্যে সব জিনিস থাকে না, যে-বৃত্তির সাহায্যে ভালো ও মহৎ কবিতা উপভোগ করা যায় সেটাই অনেকের মধ্যে অনুপস্থিত, এবং এ-কথাটা অকুণ্ঠে মেনে নেয়াই বোধ হয় ভালো। অধিকাংশ মানুষের মনের রচনাই এমন যে নিচু জাতের পদ্য না-হ'লে সেখানে কোনো ছায়াই পড়বে না। জনতার কবিরা তাঁদের অজস্র রচনার দ্বারা একটি ন্যায্য ও বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষাই মেটান সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ-উত্তরে মন সম্পূর্ণ তৃপ্ত হ'তে চায় না। এটা ধ'রে নিচ্ছি যে ভালো কবিতা উপভোগ করা ভালো জিনিস, এবং কোনো সমাজে যত বেশি লোক সেটা করে, ততই তার পক্ষে মঙ্গল। যাকে পপুলার

আর্ট বলে তার উচ্ছেদ কখনোই সম্ভব নয়, কিন্তু সাধারণভাবে রুচির বিকাশ ঘটানো হয়-তো যায়। সেই উদ্দেশ্যে অনেক সমালোচকের লেখনী নিয়োজিত হয়েছে ও হবে। কখনো-কখনো একটা দেশের রুচি নষ্ট হ'য়ে যেতে থাকে; আবার কখনো সাধারণ কালচারের স্তর এত উঁচুতে ওঠে যে ভালো কবিতা অনেকেরই অধিগম্য হয়। নির্ব্বোধ কি মূর্খের কথা বলছি না, কবিতার নাম শুনলেই যে নাক শিঁটকোয় তার কথাও নয়—কিন্তু সাধারণরকম শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান, সাধারণরকম কাব্যপ্রিয় মানুষ তেমনি কোনো রুচি ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় যে উপকৃত না-হ'তে পারে তা নয়। যে-বৃত্তি দিয়ে ভালো কবিতার উপভোগ সেটার উন্মেষ তার মধ্যে হ'তে পারে। এটা প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে এমন কথা জোর ক'রে বলবার উপায় নেই, সম্ভাবনা হিসেবেই বলছি। সম্ভাবনাটাও সকলের পক্ষে নয়, কারো-কারো পক্ষে। কবি তৈরি করা যায় না, কিন্তু অনুকূল অনুষঙ্গে কবিতার পাঠক তৈরি হ'তে পারে। ভালো পাঠকের সংখ্যা অল্প কিছু বাড়ানো যেতে পারে, এবং ভালো পাঠক যত বেশি হয়, কবির ও কবিতার পক্ষে ততই ভালো।

'কবিতা' সংক্রান্ত সমস্ত চিঠি-পত্র ১২ যোগেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

'কবিতা'র প্রতি সংখ্যা নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য:

এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স্ : ১৫ কলেজ স্কোয়ার
গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড্ কোং : ১১ কলেজ স্কোয়ার
ডি, এম্, লাইব্রেরি : ৪২ কর্ণ্ওয়ালিস ষ্ট্রিট

কলিকাতার গ্রাহকরা এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স্-এও 'কবিতা'র বার্ষিক মূল্য জমা দিতে পারেন।

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : প্রেমেন্দ্র মিত্র : সহকারী সম্পাদক : সমর সেন

৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে প্রভাতচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

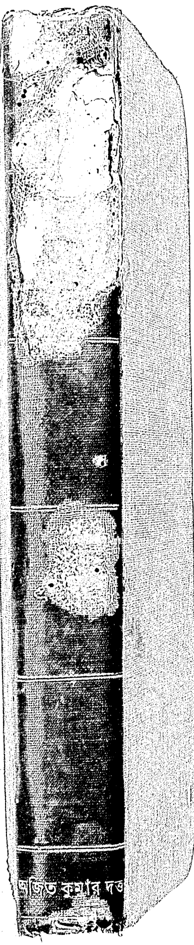
অজিত কুমার দত্ত